খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

গল্প-সঞ্চয়ন

।। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ঃ কলিকাতা ১২ ।।

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

॥ মহালয়া। ১৩৬২ ॥

দাম : তিন টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান কর্তৃক নবীন সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত
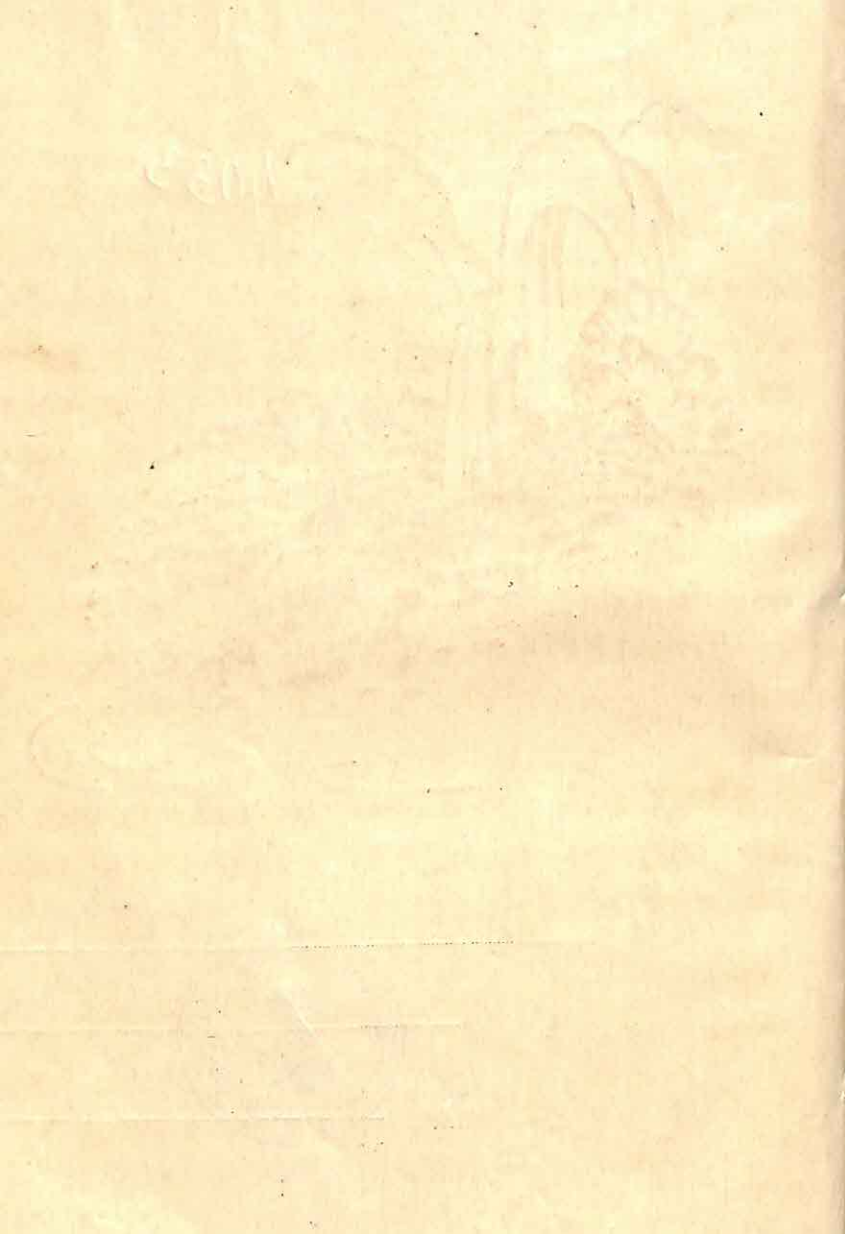
ভূমিকা

এই গ্রন্থখানি আমার কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও পূজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক দিন থেকে ইচ্ছা থাকলেও এমন একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ আমার ঘটে নি। কিন্তু প্রকাশক মহাশয়ের সহযোগিতা এবং স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের উৎসাহ ও সাহায্য আমার সে ইচ্ছা সফল করেছে। এজন্য তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এই সংগে আশুতোষ লাইব্রেরির কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তাঁদের অনুমতি না পেলে "চালদাপুরের জঙ্গলে", "কপালের লেখা", "চাওড়ীপোতার চণ্ডীভূত", "চন্দনপুরে" প্রভৃতি ছয়টি সর্বজন-প্রশংসিত গল্প এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

পরিশেষে বলা দরকার যে, রস-বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থের গল্পগুলি নির্বাচন করা হয় নি, পাঠকবর্গের অভিমতের ওপর ভিত্তি করেই সেগুলি নির্বাচিত হয়েছে।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৬২

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচীপত্র

গল্প			পৃষ্ঠা
'পিরে মামার' পাল্লায়	...	....	১
চরের দৈত্য	....	....	১৭
চালদাপুরের জঙ্গলে	....	....	২৭
মৌটুস্‌কী	....	....	৩৯
গণেশচন্দ্রের অশুভ যাত্রা	....	....	৪৭
কপালের লেখা	....	...	৬৩
কাঁটাখালি ও কোদালচাঁচি	....	....	৭৭
মিণ্টুর ছবি	.	...	৮৮
চাঙড়ীপোতার চণ্ডীভূত	....	...	৯৩
চন্দনপুরে	....	...	১১৩
একখানি আলোছবি	....	...	১২১
কাগজের বাক্সর কারিগর	...	....	১২৯
শূন্যমাঠের কান্না	...	...	১৩৮
রূপোর পেয়ালা	...	...	১৪৩
বাবুর কাণ্ড	....	...	১৫০
খোকার মাস্টার	....	....	১৫৯
বেলুনওয়ালা	...	....	১৭৮
কালীমোহন ও হরিমোহন	....	...	১৮৪
এক প্যাকেট লজেন্‌সে	....	...	১৯৬

'পিরে' মামার পাল্লায়

মামার সঙ্গে দেখা হলো কলকাতায় নয়, কাশী, দিল্লী বা মথুরায়ও নয়—পথে এবং রাঁচীতে। বাড়ি থেকে বার হলুম একা, মামা জুটলেন হাওড়া স্টেশনে।

গাড়ি তখন ছাড়ে ছাড়ে মামা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আমাদের কামরায় ঢুক্‌লেন।

দিব্যি চেহারাখানি। বেঁটে-খাট লোকটি, একমুখ গোঁফ, শরীর-জোড়া ভুঁড়ি, গায়ে কালো ছিটের কোট, চোখে চশমা, মাথায় কাঁচা-পাকা উস্ক-খুস্ক চুল, হাতে ভট্‌চায মার্কা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তার সঙ্গে একটি পিতলের ঘটি বাঁধা, বগলে ঢোলকের মতো বালিশ। তাতে একখানি লাল-কাল ডোরাদার সতরঞ্চি ও দেশী কম্বল জড়ানো। মামা হাঁপাতে হাঁপাতে কামরার ভেতরটা এক ঝলকে দেখে নিয়ে, আমার কাছে সরে এসে এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কতদূর ?"

বললুম, "গাড়ি যতদূর যায়—"

"ছিন্নমস্তা দেখ্‌তে যাওয়া হচ্ছে বুঝি ?"

"না মশাই। মাথা একটা; ছিন্নমস্তা দেখতে যাব এমন সাহস আমার নেই।"

"বটে—বটে। রাঁচী যাওয়া হবে?" বলতে বলতে তিনি আমার স্থটকেশের ওপর তাঁর ব্যাগ ও বিছানাটা রেখে একবার কোটের পকেট ক'টা পরীক্ষা কর্‌লেন। তারপর কোমর চুল্‌কোনোর ছলে

ট্যাঁকটাও একবার হাত দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বললেন—"আমিও যাব রাঁচী। পোঁছতে সেই কাল যার নাম বেলা দশটা। রাতখানা যদি একটু বসেও যাওয়া যায়—আপনার—তোমার বেঞ্চিখানা ছোট—দুটো বিছানা ধরে না। কেমন নয় ?"

"দেখ্তেই তো পাচ্ছেন—"

"তা' দুজনে ঐতেই বসে গল্পে রাতখানা কাটিয়ে দেওয়া যাবে ? কি বল ?"

বলবার ইচ্ছা ছিল অনেক, কিন্তু মামা তাড়াতাড়ি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"রাগ করো না। এ কামরায় একমাত্র তুমিই দেখ্ছি বাঙালী আর সব সাহেব হয়ে গেছে। ঐ শোন ভূতগুলো কেবল ইংরেজীতে কথা বলছে। বাঙালীদের মুখে বাংলার বদলে কেবল ইংরেজী কথাবার্তা শুন্লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এইখানে হাত বুলিয়ে দেখ, কাঁঠালের মতো হয়ে উঠেছে"—বলতে বলতে মামা তাঁর সলোম কাল হাতখানা আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি অবশ্য তাতে হাত বুলিয়ে দেখলাম না। তারপর বল্লেন—"আমার এক ভাগ্নে আছে, নাম পাঁচু। তোমাকে অনেকটা তার মতো দেখ্তে—। তাই 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। কিছু মনে করো না, ভায়া। সে আমাকে 'পিরে মামা' বলে ডাকে"—

"কেন ? আপনি কি পীরের দয়ায়— ?"

"না রে বাপু। তোদের মতো ভাগ্নে যার আছে, সে 'প্রমথ' থেকে ডাকে ডাকে ছোট হয়ে 'পিরেতে' গিয়ে ঠেকে—" বল্তে বল্তে তিনি আমার পাশে বসে একটি আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

অতঃপর দুজনে চুপ-চাপ বসে আছি। গাড়ি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে। কামরার ভেতর নানা রকমের 'বাঙালী সাহেব।' কথাবার্তায় বুঝলুম, তাদের কেউ ওকালতি পাশ করে চাকরি করছে, কেউ মুন্সেফের কেরানি, কেউ ওভারসিয়ার, কেউ ছাত্র, কেউ বা বাতে আড়ষ্ট পেন্সনভোগী। তাদের ইংরেজী বুলির সুতীক্ষ্ণ কণ্টক অবিরত বর্ষণ হচ্ছে। বল্‌লুম—"মামা, এই সব বাঙালী সাহেবদের মুখে ইংরেজী শুনে আমার গায়ে কাঁটার বদলে কঞ্চি গজাচ্ছে যে—"

মামা "হেঃ—হেঃ—হেঃ" করে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পিঠে একটা থাবা দিয়ে বললেন—"আমি দেখেই বুঝেছি, তুই আমার পেঁচোর মতো—"

মামার হাসি আর থামে না। হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল, ভুঁড়িটা নাচতে লাগল ; গলাও বোধ হয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল। কেননা উলুবেড়ে স্টেশনে এসে গাড়ি থামতেই মামা বললেন—"পেঁচো ডাব খাবি ? এখানকার এক একটা ডাব যেন এক একটা খেজুর রসের হাঁড়ি। খা—খা—এই ডাব—ওরে ডাব—" বল্‌তে বল্‌তে মামা জানলা গলিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে গলা বাড়িয়ে দিলেন।

আমার লজ্জা করতে লাগ্‌ল। এই সাহেবদের দলে বসে ডাব খাব ? তাও কাচের গেলাসে ঢেলে নয় ডাবে চুমুক দিয়ে ? জলে জামা ভিজবে, খেতে খেতে চুক্‌ চুক্‌ আওয়াজ হবে যে !

কিন্তু মামা নিতান্ত নির্লজ্জ। দু আনা দিয়ে দুটি ডাব কিনে মুখ ছাড়িয়ে একটা আমার হাতে দিতে দিতে বল্‌লেন—"জলটা খা ; ভারি

মিষ্টি। শাঁসটাও বলরামের সরভোগের মতো নরম। জল খেয়ে ডাবের খোলটা ফেলিস্ নি, পথে শাঁস খাওয়া যাবে। খা—খা— লজ্জা কিসের ? ওদের পয়সায় খাচ্ছিস্ নাকি ? পয়সা তোর—" বলেই মামা চোঁ চোঁ করে জলটা এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেল্‌লেন। তারপর তুললেন একটা লম্বা ঢেকুর !

আমাদের কাণ্ড দেখে গাড়িশুদ্ধ সাহেবরা চুপ্। মিনিট খানেক পরে তাঁদের একজন মাতৃ ভাষায় বল্‌লেন—"ডাব", একজন বল্‌লেন— "সুইট", একজন বল্‌লেন "এখানে আমার সিস্টারের শ্বশুর বাড়ি।"

মামা বল্‌লেন—"পয়সা দু' আনা দে পেঁচো—"

বল্‌লুম—"মামা, আমার কাছে তো খুচরো পয়সা—"

"চালাকি রাখ্—খুচরো নেই বললেই হলো—?"

"আচ্ছা, আপনিই দিয়ে দিন না, পরে আমি—"

মামা চট্ করে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লেন, "আমার কাছে এক শ' টাকার নোট, আর দুখানা মোহর আছে। বড় ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি বাবা ! প্রাণের ভেতরটা অনবরত ধুক্‌পুক্ করছে"—

ইচ্ছে করছিল, মামার ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখি। মামা কিন্তু চট্ করে সরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে বল্‌লেন—"ঐ ডাবওয়ালা এসেছে— দে পয়সা দে—ওরে বাবা, তোর কাছে টাকার পয়সা আছে? নেই ! তবেই তো মুশ্‌কিল। আচ্ছা, দামটা কাল নিলে হয় না? আমরা ক্যানভ্যাসার—রোজই তো এ পথে—"

ঘণ্টা পড়ল, গাড়ি হুইস্‌ল্ দিলে, ডাবওয়ালা গাড়ির ফুটবোর্ডের ওপর উঠে মামার দিকে তাকিয়ে হাঁকলে—"পয়সা দিন মশায়—"

ব্যাপারটা ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠছে; কিন্তু মামা নির্বিকার। অগত্যা পকেট থেকে একটা দু' আনি বার করে ডাবওয়ালার হাতে দিলুম।

গাড়ি আবার চলছে। বি. এন. আরের গাড়ি কখনও ডুল্‌কি চালে, কখনও নাচতে নাচতে চলে। সে দোলায় ও নাচে ঘুম তো দূরের কথা, দু'দণ্ড স্থির হ'য়ে বসে কার সাধ্য! মামার চোখ দুটো কিন্তু বুজে আস্‌তে লাগল। মামা বল্‌লেন—"যদি ঘুমিয়ে পড়ি ডেকে দিস্‌ বাবা। গাড়ি যে রকম দুল্‌ছে, এতে ঘুম হওয়া—"

"হুঁ। কিন্তু ঘুমোবেন কোথায়? এই তো আড়াই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া বেঞ্চি, দুজনে বসেছি তাও কষ্টে।" মামা আমার কথার উত্তর দিলেন না। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিনি গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে হাঁ করে অঘোরে ঘুমোতে লাগলেন, মাঝে মাঝে আমার গায়ে ঢলে পড়েন।

কামরার সকলেই শুয়ে পড়েছে। তার মাঝে আমি কেবল প্রহরীর মতো একা জেগে বসে। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার। তার গায়ে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী। মাঝে মাঝে দু' একটি আলো দেখা যায়—তা হয়তো কোন পথিকের লণ্ঠনের, নয় কোন গ্রামের। এ দৃশ্যের আর শেষ নেই। এক একবার ভাবি, মামাকে ডেকে গল্প জমিয়ে তুলি। কিন্তু মামা তখন ঘুমের দেশে বাঁশী বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এমনি করে সারারাত কাটিয়ে, দীর্ঘ পথ পার হয়ে প্রভাতে পাহাড়ের দেশে পোঁছনো গেল। মামাও চোখ মেলে তাকিয়ে

বল্‌লেন, "উঃ! সারারাত কি কষ্টেই গেছে! এক মিনিটও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলুম না। এ কোথায় রে? ওরে পেঁচো, দেখ্‌ দেখ্‌ ঐ পাহাড়গুলোর মাথায় সূয্যি উঠছে। বাঃ! কি চমৎকার শোভা"—বলেই গাড়ির মেঝের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"ঐ যাঃ! ডাব দুটো খাওয়া হয় নি। আর খাবই বা কি ছাই? সারারাত যে কষ্ট! থাক্‌, দু পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবার একটু চাঙ্গা হওয়া যাবে। সামনেই মুরী স্টেশন—"

গাড়ি মুরী এসে থামল। মামাকে ফেলেই তাড়াতাড়ি বিছানা-পত্র মুটের মাথায় চাপিয়ে ছোট রেলে গিয়ে উঠ্‌লুম। ভাবলুম—বাঁচা গেল! কিন্তু তারপরই দেখি, পিরে মামা হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বগলে বিছানা। কামরায় ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে মামা বল্‌লেন, "একটু তর সইল না? নে বিছানা আর ব্যাগটা ধর্‌—আমি চায়ের যোগাড় দেখি। কি চা খাবি? হিন্দু না মুসলমান?"

বললুম, "মুসলমানের"।

"সে কি করে হবে? মুসলমানেরা বেচে পেয়ালায়, হিন্দুরা বেচে ভাঁড়ে। সে হবে না—ভাঁড় পবিত্র পাত্র। আমি হিন্দু চায়ের যোগাড় করছি। আমি ওসব অনাছিষ্টি পছন্দ করিনে।"

মামা চলে গেলেন। তার একটু পরেই ফিরলেন, হাতে দুটি গরম চায়ের ভাঁড়। তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে মামা বল্‌লেন, "নে ধর্‌—চাটা জুড়িয়ে গেল। মিষ্টি হয়েছে? চিনি চাই না তো! এখানকার লোকগুলো ভারি পাজী, লোক ঠকিয়ে পয়সা নেয়—" বলেই প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে পবিত্র চায়ের

ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বললেন—"আঃ!" তাঁর গোঁফে চা লেগে গেল। মামা জিভ দিয়ে গোঁফ জোড়া চেটে নিলেন।

চায়ের দাম দিতে হলো আমাকেই। তার একটু পরে অনেক আড়ম্বর করে গাড়ি ছাড়ল এবং প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে চ'লল। পথের দুপাশে ধানক্ষেত; দূরে বনাচ্ছন্ন নীল শৈলমালা। মাঝে মাঝে গরু-মহিষ-ছাগল চরছে। সারারাতের অনিদ্রায় ও ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। মামা ঠেলা দিয়ে বললেন, "ঘুমোস্ নি পেঁচো—শোভা দেখ। রাঁচীর শোভা বড় সুন্দর।"

ক্রমে গাড়ি পাহাড়ের মধ্যে ঢুক্‌ল। দুপাশে পাহাড়—নীল চূড়া, তলা থেকে সারা গায়ে সবুজ বন। মামা বলে উঠ্‌লেন, "কি চমৎকার! ঐ দেখ পেঁচো সর্ষেক্ষেত।"

দেখলুম, সবুজ বনের মাঝে মাঝে হলুদ রঙ ঢালা।

"ঐ দেখ্ পাহাড়ে নদী—ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে, কালো পাথরের পাশে পাশে বয়ে চলেছে। তোদের কোলকাতায় এ সব আছে?"

"না মামা। আবার কোলকাতার যা, তাও এখানে নেই—"

"ঠিক বলেছিস্—"

ক্রমে গাড়ি রাঁচীর কাছে এল। মামা বললেন, "ঐ দেখ্ চা বাগান। রাঁচী জায়গাটা বি. এন. আরের দার্জিলিঙ—"

মামার কথা শুনে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—দুপাশে ছোট ছোট খান কয়েক চা বাগান। চা-গাছগুলো তখন ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। বললুম—"মামা রাঁচীর চা খায় কে?"

"এখানে যারা আসে তারাই খায়।"

গাড়ি তখন বাঁক ঘুরছিল। মামা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—"ঐ দেখ রাঁচীর শহর—বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে, ঐ রাঁচীর পাহাড়, ওপরে মন্দির। রাঁচীতে কোথায় থাক্‌বি বল্‌তো ?"

ভাবলুম, মামার এ প্রশ্নের উত্তর খুব চালাকির সঙ্গে দিতে হবে। মমাকে না এড়ালে আর রক্ষে নেই ; বললুম—"আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি—"

"কোথায় ?"

"জায়গাটা জানি না। আত্মীয়টি স্টেশনে আসবে। আপনি কোথায় থাকবেন ?"

"আমারও এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেও স্টেশনে আসবে—"

"যদি না আসে !"

"তা হলে তোর আত্মীয়ের বাড়িতেই উঠ্‌ব—"

সর্বনাশ ! আমি মামাকে এড়াতে চাই কিন্তু মামা আমাকে ছাড়ে না যে ! এখন উপায় কি ? বললুম—"মামা সে যদি না আসে !"

"তার ঠিকানা জানিস্‌ তো ?"

"না—"

"কুচ্‌ পরোয়া নেহি ! হোটেল আছে—"

আমি চুপ্‌ কোরে রইলুম। তারপর গাড়ি স্টেশনে আস্‌তে আস্‌তেই আমার বিছানা ও স্যুটকেশ নিয়ে চট্‌ কোরে নেমে তাড়াতাড়ি গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালুম, মামা তখনও প্ল্যাটফরমে। গেটের ওধারে সামনেই ছিল ট্যাক্সি। তাতে উঠেই দিলুম রওনা।

ট্যাক্সি তখনও গজ পঞ্চাশেক যায়নি, চীৎকার শুনে পিছনে ফিরে

দেখি—পিরে মামা, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বগলে বিছানা। মামা আমাকে ডাকতে ডাকতে ছুটছেন। রাস্তার লোকজন তাঁর ও আমার দিকে তাকিয়ে অবাক্। এখনই হয়তো লোকে ভাব্‌বে, আমি ওঁর কিছু নিয়ে পালাচ্ছি। ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পড়ার চেয়ে মামার মতো দ্বিপদ জীবের হাতে পড়া ভাল। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে—"মসায়, ভদ্রলোকের কিছু লিয়ে পালাচ্ছেন না কি ?"

"না। আমারই একটা জিনিষ ওঁর কাছে আছে—"

"তবে উনাকেও চড়িয়ে লিন্—"

যে আজ্ঞা। গাড়ি থাম্‌ল। মামা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়িতে উঠে বল্‌লেন—"কি রকম লোক বলদিকিন তুই ? বুড়ো মানুষের সঙ্গে ইয়ারকি !"

মামার কথার কোন উত্তর দিলুম না; ভাবলুম্, এখন ভাগ্যে যা থাকে হোক্। মামাকে নিয়ে একটা হোটেলে উঠলুম। মনে মনে স্থির করলুম, এখান থেকে যত শীঘ্র পারি পালাব। নাহলে, মামার ঠেলায় শেষে এখানকার পাগলা গারদে বাসা নিতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে এক ঘুম দিয়ে যখন উঠ্‌লুম তখন বেলা পড়ে আস্‌ছে।

চা খেয়ে মামাকে নিয়ে শহর দেখ্‌তে বার হলুম। ছড়ানো শহর; দেখবার বিশেষ কিছু নেই, হেঁটেও সব দিকে যাওয়া যায় না। কতক হেঁটে, কতক রিক্সয়, কতক ট্যাক্সিতে চড়ে ঘোরা গেল। হোটেলে ফিরতে ফিরতে বললুম—"মামা, পাগলা গারদটা একবার দেখলে হয় না ?"

"না, না, না। ওখানে আমি যাব না—"

"কেন। ভয় কিসের ?

"ভয়টয় না ; আমি যাব না—"

মামার কথায় একটা ফন্দী মাথায় এল ; মামার হাত থেকে নিস্তার পাবার এই এক উপায়। বললুম—"মামা এইবার মনে পড়েছে। ঐ পাগলা গারদের এক কেরানির বাড়িতেই আমার উঠবার কথা ছিল। হোটেলে থেকে আরাম হচ্ছে না, কাল ওখানেই যাব। আপনাকেও আমর সঙ্গে—"

"সে হবে না। আমি যাব না। আচ্ছা, তুই কি লোক বল্‌তো ? বুড়ো মানুষের সঙ্গে ইয়ারকি করিস্ ?"

"ইয়ারকি নয় মামা সত্যি বলছি—"

মামা গুম্ হয়ে বসে রইলেন ; হোটেলে এসে কোন কথা বললেন না। এমন কি ঘুমের ঘোরেও তাঁর নাক ডাকল না।

পরদিন ভোরে উঠে মামা বললেন, "তুই সত্যি যাবি ?"

"এর মধ্যে মিথ্যের কি আছে ?"

"তুই মনে করিস্‌নি পাগলা গারদকে আমার ভয়। আমি তো পাগল নই তবে আর ভয় কিসের ? তবে কিনা পাগলামী আমার ভাল লাগে না। যদি বলিস্ গারদের ত্রিসীমানায় যাবি না, তা হলে তোর সঙ্গে যেতে পারি—"

"গারদের ভেতরই তো থাক্‌ব—"

"তবে তুই যা, কিন্তু যাবার আগে বুড়োকে একবার হুঁড্রু প্রপাতটা দেখিয়ে আন্ ভাই—"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমিও ওটা দেখ্‌তে চাই; যদি আজই দেখা হয় তো কাল আর এখানে থাক্‌ব না। বললুম—"বেশ। চলুন—"

সকালে যথাসাধ্য পেটপুরে খেয়ে মামাকে ও ক্যামেরাটা নিয়ে হুঁড্রুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। রাঁচী থেকে যেতে হবে সাতাশ মাইল দূরে। কাজেই মোটর-যান ছাড়া আর কিছুতে যাওয়াও সুবিধার নয়।

দুজনে একখানা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছি। পরিষ্কার পথ; দুপাশে তরু শ্রেণী। তার পর উঁচু-নিচু মাঠ ধানে ভরা. তার শেষে ঘন বনাচ্ছন্ন নীল শৈলমালা। তার বহু ওপর দিয়ে নিচে বনে বনে, শৈলশিরে ছায়া বুলিয়ে দলে দলে মেঘ ভেসে চলেছে। রাঁচী কোল, মুণ্ডা ও উঁরাও প্রভৃতি আদিম মানবের দেশ। এদের রঙ্‌ ঘোর কালো কিন্তু দেহ সুস্থ, সবল, শ্রীযুক্ত। যারা শহরের কাছে থাকে বা মিশনারীদের পরিচয় পেয়েছে, তারা কতক সভ্য। তারা কাপড়-চোপড় পরে, কেউ কেউ লেখা-পড়াও শিখেছে ও শিখ্‌ছে।

মামা বলে উঠলেন, "আরে কি চমৎকার! দেখ্‌ দেখ্‌—ঐ মেয়েগুলো কিরকম সেজেছে। ফটো নে—ফটো নে—"

সত্যিই চমৎকার! সুস্থ, সবল, ঘোর কালো বরণ মেয়েগুলো, পরনে টক্‌টকে লালপাড় মোটা শাড়ী, মাথায় কালো চুলের রাশ তেল দিয়ে পরিপাটি কোরে আঁচড়ে এলো খোঁপা-বাঁধা; মুখে হাসি, দাঁতগুলি ফুট-ফুটে সাদা; কানে, সিঁথিতে ও খোঁপায় হলুদ বরণ সর্ষে ফুলের ছোট ছোট গুচ্ছ। তারা পথ দিয়ে দলে দলে চলেছে।

ট্যাক্সি সমানে ছুটে চলেছে, পথের দৃশ্যও সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে

উঠ্ছে। সমুখে ও দুপাশে শৈলমালা এবং বন, পথও জনবিরল। মাঝে মঝে দু' একখানি গ্রাম চোখে পড়ে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগছে রে পেঁচো ?"

"বেশ।"

তখন গাড়ি ঘন শালবনের মাঝ দিয়ে ছুট্ছে। মাইল পোস্ট দেখে বুঝলুম, পথও ফুরিয়ে এল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন এক জায়গায় এসে পোঁছলুম, যেখান থেকে এক মাইলের কিছু ওপর হেঁটে যেতে হয়।

গাড়ি থামতে থামতেই গাইড এল; হিন্দীতে বললে—"বনে পথ হারিয়ে যাবে বাবু আমাকে সঙ্গে নাও—"

মামা খাঁটি হিন্দীতে বললেন—"জীবনমে কখন পথ নেহি হারায়া হ্যায়। হাম্ আদমী আর পথ দুই-ই চিন্তা। চল্ পেঁচো—কুচ পরোয়া নেহি—"

পিরে মামা যখন সঙ্গে আছেন, তখন শহরে পথ হারালেও বনে পথ হারাব না। মামার সঙ্গে নির্ভয়ে চললুম; গাইড ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে মনে মনে শাপ দিতে লাগ্ল।

কিছুদূর গিয়েই দেখি, গজ সাতেক চওড়া ও প্রায় কোমর সমান গভীর একটি জলধারা। তাতে স্রোত অল্প; খান কয়েক বড় বড় পাথর ভেদ করে ধারাটি নেমে আস্ছে। তার তীরে জন কয়েক হিন্দুস্থানী একখানি খাটুলি নিয়ে বসে। ভাবলুম, জায়গাটা বোধ হয় শ্মশান। এঁরা কাউকে ভবনদী পার করে দিয়ে তীরে বসে বিশ্রাম করছেন।

কিন্তু তাদের কাছে যেতেই একজন মামাকে বল্লে, "খাটিয়া চাই হুজুর ?"

মামা চম্‌কে উঠ্‌লেন। আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বললেন—"এরা অমন অলুক্ষুণে কথা বলে কেন রে পেঁচো! খাটিয়া কি হবে? আমরা বেঁচেই তো আছি? ঐ তো তোর হাত-পা নড়ছে, আমিও কথা বল্‌ছি। তবে?"

আমিও অবাক্‌ হলুম; জিজ্ঞাসা করলুম—"ক্যা বোল্‌তা?"

তারা বললে—"জুতো পায়ে দিয়ে জলধারাটা পার হবেন কি করে? আমরা খাটিয়ায় বসিয়ে পার করে দেব কি?"

মামা বল্‌লেন—"মৃত্যুকা আগাড়ী কারো কাঁধমে নেই চড়েগা। যব মরেগা তখনও তোমারা কাঁধমে চড়েগা নেহি? বিশুদ্ধ ভটচায্যি বামুন কা কাঁধমে চড়কে বৈতরণী পার চলা যায়গা—"

মামার কথা শেষ হতে না হতে ওপারে একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন; তাঁর ওজন কিছু না হলেও অন্ততঃ সাড়ে তিন মণ হবে। তাঁকে দেখেই খাটিয়াওয়ালারা সদলে এপার থেকে হাঁক্‌তে লাগল্‌—"থোড়া ঠার জাইয়ে হুজুর—"

আমরা ভাবলুম, ভদ্রলোকটি যদি শখ করে জলে নামেন তাহলে নিশ্চয়ই খানিকটা জল বাড়বে। উনি জলে নামবার আগেই আমাদের ওপারে পৌঁছনো নিতান্ত দরকার। দুজনে তাড়াতাড়ি ধারাটি পার হয়ে পথ ধরে চলতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, খাটিয়াখানি ও খাটিয়াওলাদের কথা। হয়তো ফিরতি পথে দেখবো, ডাঙা খাটিয়া অথবা ঘাড়ভাঙ্গা দু-তিনটি লোক ওখানে দেহ রেখেছে।

চলতে লাগলুম।

সরু পথ, লোকের পায়ে পায়ে তৈরী হয়ে পাথরের কোল দিয়ে,

মাটির ওপর দিয়ে, গাছের তলা দিয়ে, ঝোপের পাশ দিয়ে, এঁকে-বেঁকে উঠে-নেমে চলে গেছে। কিছুদূর গিয়েই অর্থাৎ মাইল খানেক আগে থেকেই প্রপাতের পতনের গুরুগম্ভীর শব্দ কানে এল। দুপাশে নির্জন বন, ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া বইছে। দুটি একটি শুকনো পাতা বনের তলায় খসে পড়ছে। দুটি একটি পাখী সহসা ডেকে উঠ্ছে। কদাচিৎ দু-একটি পথিকের দেখা পাই।

আকাশে ধীরে মেঘ জমে উঠ্ছিল; বন-পথে যেটুকু আলো ছিল, এবার গেল মুছে। সারা আকাশে জলভরা কালো মেঘ। মামা বললেন—"পেঁচো সর্বনাশ। বৃষ্টিতে ভিজে শেষে অসুখ করবে রে—"

মামার কথা শেষ হতে না হতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নাম্ল।

মামা বললেন—"গাছতলায় দাঁড়া—"

"আপনি থাকুন—আমি চললুম—"

"সে কি করে হবে? এই বনবাসে আমি একা থাকব!" বল্তে বল্তে মামা আমার পিছু নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রপাতের ধারে এসে দাঁড়ালুম! আর মুষলধারে নাম্ল বৃষ্টি।

চারধারে ঘন বন ও পাহাড়। তার মধ্য দিয়ে সুবর্ণরেখা ছুটে এসে একটি পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে। তার গুরুগম্ভীর শব্দে দৃশ্যটি আরও গম্ভীর। নীচে থেকে ধোঁয়ার মতো জলকণা উঠে বাতাসে চারধারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা দুজনে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। বৃষ্টি থামলে ধারাটির একেবারে ধারে গিয়ে

ওপর থেকে খান কয়েক ফটো তুললুম। তারপর বললুম—"মামা, এবার নিচে চলুন—"

"নিচে ? না—না শুনেছি ওখানে ভাল্লুক থাকে—"

"থাকুক। আমি যাবই—"

"শোন্—আমার কথা—ছেলে মানুষী করিস্ নি—"

"আপনি থাকুন ; আমি যাবই—"

"যদি একান্তই যাস্, আবার ফিরে আসিস্ বাবা। আমি বুড়ো মানুষ। যদি ভাল্লুক-টাল্লুক—"

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হলো। মামা চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন—"ঐ শোন্—ভাল্লুক—!" বল্‌তে বল্‌তে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন।

আমি আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম—"ওটা বন্দুকের শব্দ। ভাল্লুকটা মারা পড়েছে—আপনি থাকুন—"

মামা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে একখানি পাথরের ওপর বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি চলেছি। বৃষ্টিতে বন ভিজে, পথ পিছল, দৃশ্য কোমল। সমুখে দুধারে শৈলশ্রেণী তার মাঝ দিয়ে রুপোর ধারার মতো সুবর্ণরেখা এঁকে বেঁকে চলে গেছে সুদূরে সাগরের পানে। আমি খুব সাবধানে নিচে নেমে প্রপাতের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে সুবর্ণরেখার নৃত্য দেখলুম। ছিন্নমেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যকিরণ পড়ে তার চঞ্চল দেহখানি ঝলমল করে উঠছে। পা থেকে কিরণোজ্জ্বল জলকণা

চারধারে কখনও রুপালী, কখনও বা রামধনু রঙের ওড়নার মতো বাতাসে উড়ছে। চমৎকার! সুন্দর! মনোরম।

ফিরে যখন এলুম, তখনও মামা সেই পাথরখানার ওপর বসে। আমাকে দেখে তিনি হাঁপ ছাড়লেন। কিন্তু আরও দুটো দিন থাকবার ইচ্ছা থাকলেও আমি সেই দিনই মামাকে ফাঁকি দিয়ে এক ফাঁকে এসে রেলে উঠলুম। তবুও বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগল—এই বুঝি পিরে মামা আসে। শেষে রেল যখন ছাড়ল আমারও বুকের ভার গেল নেমে।

তারপর থেকে মামার আর দেখা পাই নি। তবে এখানে কতকটা সেই রকমেরই একজন লোকের দেখা মাঝে মাঝে পাই—সেই নাক, সেই ভুঁড়ি, সেই গোঁফ, চোখে সেই চশমা। কিন্তু তিনিই আমার সেই পিরে মামা কি না বুঝতে পারি না। আর, তিনিও কোন দিন আমায় তাঁর পরিচয় দেন না। না দেন ভালই।

চরের দৈত্য

চৈত্র মাস—

আম-বারুণীর মেলা বসেছে সেই নদীর ওপার, মঙ্গলবেড়ের মাঠে। এপার থেকে দেখা যায় না ; ওপারে পৌঁছেও সিকি ক্রোশ গেলে তবে মেলার ধারের জোড়া আমগাছ চোখে পড়ে।

মেলায় কত গাঁ থেকে কত লোক এসেছে—কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ নৌকোয়, কেউ হেঁটে, কেউ বা ডুলি চড়ে। কেউ কেউ আবার ঘোড়ায়ও এসেছে। যত লোক তত জিনিষ—মাটির খেলনা, শাদা-লাল রঙ্ করা মাটির ঘট, বাঁশী, রাংতা-মোড়া বাঁশের তলোয়ার, কামারে ছুরি, চিনির জোড়া মোণ্ডা, রসগোল্লা, বাতাসা, খৈ, মুড়ি—কত নাম করব! আর মেলার বর্ণনাই বা করব কি! যে আমাদের মঙ্গলবেড়ের আম-বারুণীর মেলা না দেখেছে, সে বুঝবে না, সেখানে কি ব্যাপার! কি মজা!

সেদিন মর্নিং ইস্কুলের পর ছুটি হ'য়ে গেল। বাড়ির পথে হরিশ ও রামগোপাল পরামর্শ করলে, মেলায় যেতে হবে। তারা এর আগে দু'বার ঐ মেলায় গেছে ; প্রত্যেক বছরই ওখানে আম-বারুণীর দিনে মেলা বসে।

বাড়ির সাম্‌নে এসে হরিশ বল্‌লে—"তবে শীগ্‌গির খেয়ে নে—"

রামগোপাল বললে, "এত সকালে কি রে? এই তো সবে বেলা দশটা—"

"কতটা পথ যেতে হবে তার ঠিক আছে ? এখান থেকে মজলপুরের খেয়াঘাটই তো প্রায় এক ক্রোশ—তারপর—"

"ওখান দিয়ে কেন যাবো ?"

"তবে কোথা দিয়ে যাবো ?"

"এই নদীর চর ভেঙে সোজা—বেদুইনদের মতো—"

কথাটা শুনে হরিশ রামগোপালের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর বল্‌লে—"সে আমি যাব না !"

"তুই না যাস্ আমি একাই যাব—"

"যাস"—বলে হরিশ বাড়ি ঢুক্‌ল।

সেখান থেকে আর একটু গেলে একেবারে নদীর ধারে রামগোপালদের বাড়ি। রামগোপাল বার-বাড়ির উঠোনে আমতলায় দাঁড়িয়ে একবার নদীর দিকে তাকালে। এ পারে ওদের বাড়ির কাছে নদীর সরু জলধারা ; তারপর একখানা ছোট চর। তারপর আবার একটু জল, আবার একখানা ছোট চর, আবার খানিকটা জল—তারপর যে চর, তা যেন মরুভূমি—বালি, বালি, কেবল বালি ; কোথাও শাদা, কোথাও শাদায় কালোয় মিশানো। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝাউবন—তারপর শক্ত, শুক্‌নো, চাবড়া বাঁধা মাটি রৌদ্রে ফেটে-ফুটে চৌচির। ঠিক দুপুরের রৌদ্রে বা রাতের গাঢ় অন্ধকারে একা এ চর পারাপার করতে সাহস ও শক্তির দরকার।

রামগোপাল বাড়ি গিয়ে বই রেখে জামা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"মা, আমি মঙ্গলবেড়ের মেলায় যাব—"

"কার সঙ্গে ?"

"একা" বল্‌তে বল্‌তে রুক্ষ মাথায়ই গামছা নিয়ে ছুটল নদীতে।

নদীতে অল্প জল, স্রোতও সামান্য, ওপর থেকে একেবারে তলা অবধি দেখা যায়। ঐ যে চেলা মাছের ঝাঁক। রামগোপাল কোমরে গামছা বেঁধে জলে লাফিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা জলে তার গা গেল জুড়িয়ে। কিন্তু আজ আর সাঁতার কাটা হবে না। আর, সাঁতার কাটবেই বা কোথায়? নদীটা একেবারে মরে গেছে—ব্যাপারীর বড় নৌকো তো চলেই না, যা চলে জেলে ডিঙ্গি। লোকে এ ধারে হেঁটে নদী পারাপার করে। তবে মজলপুরের খেয়াঘাটে এখনও জল গভীর।

রামগোপাল একটু এদিক-ওদিক সাঁতার কেটে, জল তোড়পাড় করে, গোটা কয়েক ডুব দিয়ে ডাঙায় উঠ্‌ল। তারপর মাথা মুছতে মুছতে বাড়ির দিকে দিলে দৌড়।

বাড়ি এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লে—"মা, ভাত দাও—"

মা তখন মাছ ভাজছিলেন। বল্‌লেন—"এত তাড়া কিসের? ইস্কুলে তো যেতে হবে না—"

"বাঃ রে! ক্ষিদে পায় না বুঝি?"

"তোমার মতলব বুঝেছি। মেলায় যাওয়া হবে না—"

"কেন!"

"এই কাঠ-ফাটা রোদে তিন ক্রোশ ভেঙে যাবেন মেলায়! শেষে একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বস। উনি নেই বাড়ি—"

"কিছু হবে না—। তোমার কেবল ভয়—"

"না, যাওয়া হবে না—"

"বেশ তাই, কিন্তু তুমি আমায় ভাত দাও—"

"রান্না হোক আগে।"

রামগোপাল আর কিছু বললে না। কাল মফঃস্বলে যাবার সময় বাবা তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন। পয়সা দু'আনা সে ট্যাঁকে গুঁজলে; তারপর জুতোজোড়া ও জামাটা নিয়ে বাইরের ঘরে রেখে এল। আসবার সময় আর একবার আমতলায় দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে নদীর ওপর দিয়ে চরের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ল। ঐ ধোঁয়ার মতো গাঁ দেখা যায়, ওর কোলে এক সার শাদা ফোঁটা। বোধ হয় মেলা-যাত্রীরা চলেছে। এর মধ্যেই কি রোদ! বালি তেতে উঠে তা থেকে জলের ঢেউয়ের মতো তাত উঠ্‌ছে। এই চর ভেঙে—!

কিন্তু সে হরিশের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, যাবেই। তবে চরের দৈত্যটাকে সে মাঝে মাঝে দেখেছে। সে যেখানে-সেখানে হঠাৎ দেখা দেয়। একবার যদি তার কবলে—!

কিন্তু ভয় কি? কিসের ভয়? সে দৌড়বে—তার আগে আগে। ইস্কুলে ১০০ গজের দৌড়ে সে প্রথম। আঃ! বেলা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। মা যে কি করে তার ঠিক নেই! ইস্কুল না থাকলে কি হয়? তার খাবার অভ্যাস তো দশটার সময়।

ভেতরে গিয়ে হাঁকলে—"ও মা! দাও না; ক্ষিদেয় মরে গেলুম যে—"

"দিচ্ছি; কিন্তু তুমি কিছুতেই মেলায় যেতে পারবে না—"

রামগোপাল চুপ করে রইল। মা ভাত দিলেন।

কিন্তু সে যখন খেয়ে উঠ্‌ল, তখন বেলা প্রায় বারোটা।

মা বল্‌লেন—“ঘরে গিয়ে শোওগে—”

“দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ লাগে—”

“তবে পড় গে—”

“ছুটীর দিন পড়তে ইচ্ছা হয় না—”

“তবে কি করবে শুনি?”

“কি আর করব—?” বল্‌তে বল্‌তে রামগোপাল বাইরে বেরিয়ে গেল।

মা ডাকলেন—“গোপ্‌লা—”

“কি? এইতো আমি বাইরে—”

“কোথাও যেও না—”

“যাইনি—” বলে একটু এদিক-ওদিক করে সে জামা গায়ে দিয়ে, জুতো জোড়া হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারপর তাদের ঘাট থেকে পূর্বদিকে কিছু দূরে গিয়ে সে কাপড় গুটিয়ে জলে নামল। এখানে জল এত কম যে হাঁটু ডোবে না। সে পায়ে পায়ে নদী পার হয়ে উঠ্‌ল চরে। উঃ! কি গরম হাওয়া। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে; মুখখানা ঝল্‌সে গেল। চরের বালি—মুড়ির খোলার বালির মতো তেতে আগুন। তাতে পা ঠেকালেই ফোস্কা পড়ে। সে জুতো পায়ে দিয়ে ছোট চরখানি পার হলো। তারপর আবার জুতো খুলে, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল পার হয়ে গেল। আবার চর; তবে ছোট। তার ওপর এখানে-ওখানে কেশুর জন্মে আছে। সে কয়েকটা কেশুর তুলে চিবতে চিবতে চর পার হয়ে আবার জলে নাম্‌ল।

এধারের জলধারাটা একটু বেশি চওড়া। জায়গায় জায়গায় জলও বেশি ; সাবধানে পার হতে হয়। কিন্তু রামগোপালের ভয় নেই ; কোথায় কি আছে সে সব জানে। জল পার হয়ে এবার সে যে চরখানার ধারে এল, তাই পার হওয়া শক্ত।

তার প্রথমে কাদা ও চোরা বালি। সে বলিতে পা বসে গেলে আর রক্ষা নেই। সে একবার একটা মহিষকে চোরা বালিতে পড়ে তলিয়ে যেতে দেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও কেউ মহিষটাকে তুলতে পারে নি।

সে খুব সাবধানে কাদা পার হয়ে শক্ত মাটিতে দাঁড়াল। সেখানে একটা ছোটখাট জলা মতো ছিল ; তার জলে পা ধুয়ে জুতো পরে চারধার থেকে একরাশ কেশুর তুলে নিলে। পিপাসার সময় জলের অভাবে সেগুলো চিববে।

সামনেই সেই বড় উঁচু চর ;—ওর ওপর উঠতে হবে। সে শক্ত জায়গাটা পার হয়ে চরখানার ওপর উঠ্‌ল। সেখানে দাঁড়িয়ে এপারে তাদের বাড়ির দিকে একবার তাকালে। ঐ যে আমতলায় বড় ঘরখানা ; ওর ওধারে জামগাছ। আর, সেই একবারে ও কোণে সজনে গাছটা দেখা যাচ্ছে। রামগোপাল আর সে দিকে মনোযোগ দিল না, চরের ওপর দিয়ে চলতে লাগ্‌ল।

চরখানা পাকা একক্রোশ ; তবে তিন ভাগ পার হতে পারলে আর আর ভয় নেই, তারপর কেবল ঝাউবন। তার মধ্য দিয়ে সরু পথ এঁকেবেঁকে দূরে গাঁয়ের বাঁশঝাড়ের মধ্যে চলে গেছে। সেটা ধরে গেলেই মঙ্গলবেড়ের মাঠ।

রামগোপাল চলেছে। তার সামনে, পিছনে, পাশে শাদা বালির ছোট ছোট স্থির তরঙ্গ। মাঝে মাঝে হাওয়ায় বালি উড়ছে। রোদের ঝাঁঝে চোখ মেলে তাকান যায় না। তার মনে হলো, সে যেন বেদুইন, তবে তার উট বা ঘোড়া নেই ; সে হেঁটেই মরুভূমি পার হচ্ছে।

বালির ওপর দিয়ে কিছুতেই জোরে চলা যায় না। পা দু'খানা জড়িয়ে আসে। আবার দৌড়লে প্রতি পায়ে আছাড় খাবার সম্ভাবনা। রামগোপাল যায়, আর এদিক্‌-ওদিক্ তাকায়। কি জানি চরের দৈত্যটা কোনদিক থেকে আসে ঠিক কি ? যে হাওয়া! এখনি হয়তো হাওয়ায় ভর করে তার সামনে বা পিছনে উপস্থিত হবে !

রামগোপাল কিছু দূর চলে গেল। সবে সিকিক্রোশ পার হয়েছে। এর মধ্যেই তার পাদু'খানা ভারী ভারী ঠেক্‌ছে ; মাথা পুড়ে যাচ্ছে, মুখ ঝলসে গেছে। চোখ ও নাকের ভেতরটা জ্বালা করছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সে পকেট থেকে গোটা কয়েক কেশুর বার করে চিবতে লাগ্‌ল। কেশুরের মিষ্টি রসে গলাটা ভিজল ; কিন্তু তৃষ্ণা মিট্‌ল না। এখনও যে অনেক বাকী।

হঠাৎ সে শুন্‌লে পিছনে শব্দ হচ্ছে—হু-উ-উ-উ—।

ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। সে পিছন ফিরে দেখে তপ্ত বালি-রাশিকে ঘোরাতে ঘোরাতে তার পিছন থেকে উঠ্‌ল প্রকাণ্ড ঘূর্ণি।

ঘূর্ণিটা তার দিকেই ছুটে আসছে। ঐ যে ওর কলেবর ক্রমে বাড়ছে ; আকাশপানে মাথা উঠ্‌ল, শরীরও উঠল ফুলে। সে যেন রামগোপালকেই ধরবার জন্যে মাটির ভেতর থেকে হঠাৎ উঠে গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। রামগোপাল প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে

লাগল। কিন্তু যাবে কোথায় ? আজ তাকে দৈত্যটা একা পেয়েছে—মুখে পূরবেই।

রামগোপাল ছুট্তে ছুট্তে ফিরে দেখ্লে, দৈত্যটা একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ঐ যে তার একখানা হাত—গরম, খরখরে। রামগোপালও আর ছুট্তে পারে না। সে আবার পিছন ফিরে দেখ্লে, দৈত্যটা একটু পাশে সরেছে, তার ডান দিকে। রামগোপালও সেদিকে সরে গিয়েছিল। আর রক্ষা নেই। রামগোপালের দম বন্ধ হয়ে আস্ছে ; শরীর অবশ।

তবুও সে চট্ করে মনে মনে ঠিক করে নিলে, দৈত্যটা যদি তাকে ধরেই—সে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে চোখ বুজে পড়ে থাক্বে।

ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ দৈত্যটা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নাকে, মুখে, চোখে গরম বালির ঝাপটা মারলে। রামগোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ঐ যে সে তার জামা-কাপড় ধরে টান্ছে, এখনই তাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে এই চরের মধ্যে কোথাও ফেলে দেবে! তার চারধারে শব্দ হচ্ছে—হু—উ—উ—উ—উ—।

উঃ! কি গরম বাতাস!

সে তাড়াতাড়ি বসে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে, চোখ বুজে রইল। তার পিঠের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে—দৈত্যটা তার জামা-কাপড় ধরে টান্ছে, আর করছে—হু-উ—উ—উ—উ।

রামগোপাল মনে মনে বলতে লাগল—"আর কোন দিন দুপুর রোদে এই চরে আস্ব না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

দৈত্যের মনে বোধ হয় দয়া হলো ; সে রামগোপালকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে সরে গেল।

কিন্তু ঐ আবার আসছে! এবার রামগোপাল বাঁচবে না, নিশ্চয়ই দম্ বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সে আর বস্‌তেও পারে না! হাত—পা—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে—এ সময় একটু জল—।

কিন্তু দৈত্যটা এবার এসে তাকে ধরলে না ; তার কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে চীৎকার কর্‌তে লাগল—হু—উ—উ—উ—।

রামগোপাল সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কখন সে ছুটে আসে ঠিক কি ? ঐ যে সর্‌ছে। কিন্তু সর্‌তে সর্‌তে চরের ওপর দিয়ে হঠাৎ বাঁদিকে দিলে দৌড়।

রামগোপাল এবার সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মঙ্গলবেড়ের মেলায় যেতে আর পা চল্‌ল না ; বাড়ির দিকে ফির্‌ল। যেতে যেতে দেখলে, দৈত্যটা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ঝাউবনের ধারে গিয়ে পড়েছে। তার শরীর ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে।

ঐ যে রামগোপালের বাঁ ধারে আবার একটা ; এটা ছোট। কিন্তু খুব জোরে ঘুরছে। রামগোপালও যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চলতে লাগ্‌ল। ছোট দৈত্যটাও এগিয়ে আস্‌ছে—কখনও শরীর বাঁকাচ্ছে, কখনও ফোলাচ্ছে, কখনও নোয়াচ্ছে।

এটাও কি তাকে ধর্‌বে ? না—না—যত কষ্টই হোক, তাকে জলের ধারে গিয়ে পৌঁছতে হবেই।

ঐ যে জল, ঐযে—ঐযে—আর দশ মিনিট। কিন্তু এই দশ মিনিটের মধ্যেই দৈত্যটা এসে পড়বে।

কিন্তু না, আর ভয় নেই। দৈত্যটা চর ধরে মজলপুরের খেয়া-ঘাটের দিকে ছুটছে।

রামগোপাল দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে ভরসা হলো না। সে চর পার হয়ে নিচে নেমে নদীতে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে জল খেল ও চোখে-মুখে-মাথায় দিল। তার পর নদী পার হয়ে বাড়ি চলে গেল।

মা তাকে দেখেই বললেন—"এ কিরে গোপ্‌লা? তোর মুখখানা যে ঝলসে কালো হয়ে গেছে! জামায়, কাপড়ে, মাথায় বালি। কোথায় গিয়েছিলি? মেলায়?"

রামগোপাল ঘাড় নেড়ে বললে—"না।"

"তবে? শুয়ে পড়্, শুয়ে পড়্—" বলতে বলতে তিনি মাদুর পেতে দিলেন।

রামগোপাল কোন উত্তর দিলে না; সটান তার ওপর শুয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল।

মা কত জিজ্ঞাসা করলেন, রামগোপাল কিছুই বললে না। কোনদিন সে কথা সে কারও কাছে প্রকাশও করে নি।

কিন্তু ভীরু হরিশটা সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, রামগোপাল নদীর চরের দৈত্যের হাতে পড়েছিল, এপারে আমতলায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে।

চালদাপুরের জঙ্গলে

চালদাপুরের জঙ্গলের কাছে যখন পাল্কী এসে পৌঁছল, তখন ভর-সন্ধ্যা।

বেহারারা পথের ধারে পল্কী নামিয়ে বল্‌লে, "হুজুর, আর এগোতে সাহস হয় না ; সামনে তিন ক্রোশের মধ্যে গাঁ নেই—"

হরি ডাক্তার এতক্ষণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। বেহারাদের একটানা "হুঁ হুঁ—হো হো—ও—ও—" সুরে, বর্ষার মেঠো বাতাসে তাঁর চোখ দুটো একটু বুজে এসেছিল। অবস্থাটা হঠাৎ বদ্‌লে যাওয়ায় তন্দ্রাটুকু ছুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে বল্‌লেন—"কি বল্‌লি ?"

—"হুজুর, সাম্‌নে চালদাপুরের জঙ্গল। সাঁঝও লাগ্‌ল। জল-কাদায় পা ব'সে যায়, বৃষ্টিও বুঝি এল—"

—"তাই ব'লে একটা লোক মারা যাবে ?"

—"কি কর্‌ব হুজুর ? আমাদেরও তো প্রাণ—"

"হুঁঃ !"—বলেই ডাক্তারবাবু উঠে বস্‌লেন ; তার পর পাল্কীর ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাঁ-দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "ঐ চাঁদখালির আলো দেখা যায় না ?"

—"হাঁ।"

এমন সময় দূরে এক পাল শিয়াল তারস্বরে ডেকে উঠ্‌ল। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"ওখানে যেতে পার্‌বি ?"

—"না হুজুর। ওদিকে যেতে হ'লেও জঙ্গলটার পূব দিক ভাঙ্গতে হবে—"

—"বটে! জঙ্গলে আছে কি?"

—"হুজুর, রাতের বেলা যেনাদের নাম করতে নেই, পূব দিকে আছেন তেনারা; আর, মাঝ বরাবর হলো টিয়ার আড্ডা! আমরা যাব না—"

—"তাই ব'লে একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?"

গায়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে একজন বেহারা বল্‌লে, "কি কর্‌ব হুজুর? ঘরে ছেলে-পুলে ছেড়ে এসেছি—"

হরি ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন, "মিছে কথা! কোন বেটার [illegible]লে নেই। ঐ কে যে যায় না? এই—কে যায়?"

অন্ধকার ততক্ষণে আরও গাঢ় হ'য়ে এসেছে। যা' স্পষ্ট ছিল, তা' হ'য়ে গেছে ছায়া, যা' ছায়া ছিল তা' গলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে! যে যাচ্ছিল, সে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়াল। তার হাতে একখানা লাঠি।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"হারিকেন জ্বাল্‌। ঐ লোকটাকে এদিকে ডাক্—"

বাইরে পাল্কীর লোহার শিকের সঙ্গে একটা হারিকেন বাঁধা ছিল। একজন সেটা খুলে নিয়ে জ্বাল্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে ডাক্তারবাবুর আর ডাকের দেরি সইছিল না; নিজেই হাঁকলেন, "এই—কে তুমি? এদিকে এস—"

লোকটা কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি যাচ্ছ কোন্ দিকে ? বাড়ি কোথায় ?"

সে লাঠি দিয়ে দেখিয়ে বললে—"জঙ্গলের ওপারে—"

—"তা' তো বুঝ্‌লাম। জঙ্গলের ওপারে কোথায় ?"

—"আজ্ঞে কর্তা, তুলসীপুরই বটে তবে—"

ভাল ডাক্তার পুরোনো হলে একটুতেই চটেন। হরি রায় তা'র ওপর খুব ভাল ডাক্তার ও বুড়ো মানুষ। ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "আহাম্মক কোথাকার !"

ধমক খেয়ে লোকটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল !

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, "এখন যাচ্ছিস্ কোথায় ?"

—"আজ্ঞে জঙ্গলের ওপারে—"

—"হুঁঃ। আমায় চিন্‌তে পারিস্ ? সাতগড়ের হরি ডাক্তারের নাম শুনেছিস্ ?"

লোকটা এবার হাত জোড় ক'রে নিচু হ'য়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আজ্ঞে কর্তা, নাম শুনেছি, কিন্তু তেনার ওষুধ খাই নি—"

—"আমিই সাতগড়ের হরি ডাক্তার। আমার ওষুধের বাক্‌সটা মাথায় ক'রে তুলসীপুরের সতীশ মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছে দিতে পার্‌বি ? দু' টাকা বক্‌শিস্ দেবো—"

হারিকেনটা ততক্ষণে জ্বালা হ'য়ে গেছে। তা'র ম্লান আলোয় হরি ডাক্তার দেখ্‌লেন, লোকটার চেহারা চোয়াড়ের মতো, কিন্তু শরীর বেশ লম্বা ও বলিষ্ঠ। তার চোখের দৃষ্টি সরল নয়, বাঁকা ও রুক্ষ এবং মাথায় লম্বা চুল, পরনের কাপড় ও গায়ের চাদরখানা ময়লা।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "পার্‌বি ?"

সে বল্‌লে—"আজ্ঞে তা' পারি—"

বেহারারা বল্‌লে, "হুজুর ! এই জঙ্গল ভেঙ্গে রাতের বেলা আপনি—!"

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—"চুপ্‌ !" তারপর "আমার ছাতি, লাঠি, স্টেথস্‌কোপ আর ওষুধের বাক্‌সটা বা'র কর্‌"—বল্‌তে বল্‌তে তিনি জুতো পায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পাল্কী থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন।

পাল্কীর ভেতর তোশকের নিচে দু'পাশে ছিল ছাতি ও লাঠি ; ওপরে ছিল স্টেথস্‌কোপ ও ওষুধের বাক্‌স। বেহারারা সেগুলো বা'র কর্‌তেই ডাক্তারবাবু স্টেথস্‌কোপটা কোটের পকেটে পুরে ছাতি ও লাঠিখানা হাতে নিতে নিতে লোকটাকে বল্‌লেন, "এই শুন্‌ছিস্‌, ওরে ! বাক্‌সটা মাথায় নে। খবরদার ! ওর তলায় তেলের দাগ লাগে না যেন— !"

লোকটা গায়ের চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লে, "কর্তা ! আমরা গরীব মানুষ, তেল পা'ব কোথায় ?"

তারপর বাক্‌সটা মাথায় সে তুলে নিতে, ডাক্তারবাবু লাঠি দিয়ে লণ্ঠনটা দেখিয়ে একজন বেহারাকে বল্‌লেন, "ওটা ওর হাতে দে। চল্‌—"

বেহারারা বললে, "হুজুর ! আমরা—?"

—"তোরা বাড়ি গিয়ে ছেলে-পুলেকে নাড়ু খাওয়া গে—"

—"হুজুর, আমাদের ওপর মিছে রাগ কর্‌লেন। এই আঁধার রাতে একেবারে যমের মুখে—"

ডাক্তারবাবু কয়েক পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "যেতে

পার্‌বি নে, একথা আগে বল্‌লি নে কেন? যা—যা—বেটারা! আমার ভয় নেই! যম আমার সাঙাৎ!"

বেহারারা উত্তর না দিয়ে শূন্য পাল্কী কাঁধে তুলে সাতগড়ের দিকে ফিরে চল্‌ল। কিন্তু তাদের পা আর চলে না। ভয়ে বুক দুরু-দুরু কর্‌ছে! তারা মনে মনে বলতে লাগল, "আজকের রাতে এক মহা সর্বনাশ হবে! জয় মা কালী!—"

সেদিন সকাল থেকে সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়েছে; বিকেলের দিকে কিছুকালের জন্যে ধরেছিল, আবার ঝুর্‌-ঝুর্‌ ক'রে নাম্‌ল! হরি ডাক্তার ছাতা খুলে মাথায় দিলেন। বাক্‌সটার ওপর ছিল একখানা অয়েলক্লথের ঢাক্‌নি।

যেতে যেতে ডাক্তারবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না। অন্ধকারে ও বৃষ্টিতে সব চুপ্‌সে, মুছে, ধেবড়ে কালো হ'য়ে আছে। হারিকেনের আলোয় যেটুকুও দেখা যায়, সেটুকুর দৃশ্যও বিশ্রী। কেবল জল-কাদা, ঝোপ-জঙ্গল, মাঝে মাঝে দুটি একটি বড় গাছ। এর ওপর দিয়ে বাহকের কোমর থেকে পা দু'খানার সুদীর্ঘ কালো ও মোটা ছায়া নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। বাতাস উঠেছিল। চারধার থেকে বৃষ্টিবিন্দুর টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ, ভিজে ডালপালার দীর্ঘশ্বাস এবং ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁর সরু-মোটা নানা রকম ডাক এক সঙ্গে জোট পাকিয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, দু'জনে চালদাপুরের জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন। তবুও জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কোথায় এলাম রে?"

"কর্তা! চালদাপুরের জঙ্গলে। ঐ বাঁয়ে শিবকালীর পাট—"

ডাক্তারবাবু সেদিকে ফিরে তাকালেন ; কিন্তু অন্ধকারে দেখ্‌বেন কি ? হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল, এতক্ষণ লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নি ; বল্‌লেন, "তোর নাম কি রে ?"

—"কর্তা ! আমরা গরীব লোক ; আমাদের আবার নাম কি ?"

ডাক্তারবাবু মনে মনে বল্‌লেন, "বেটা আচ্ছা আহাম্মক তো!" প্রকাশ্যে বল্‌লেন, "তবুও—"

—"আজ্ঞে, বুনো। কর্তা, একটু ডান দিক ঘেঁসে আস্‌বেন। বাঁয়ে গর্ত—"

ডানধার ঘেঁসে যেতে যেতে ডাক্তারবাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন ; বল্‌লেন, "বুনো, ও কিসের শব্দ রে ? কে কাঁদ্‌ছে না ?"

সত্যই একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কে যেন দূরে কোথায় কাঁদ্‌ছে—"আহা—হা——হা—! আহা—হা—হা—!"

বুনো সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল ; ডাক্তারবাবুর কথার জবাব দিলে না।

—"হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই কাঁদ্‌ছে। এই দাঁড়া ! ঐ শোন্—এ যে আর্তনাদ !"

—"কর্তা ! চুপ্‌চাপ্‌ চ'লে আসুন। এখনও শিবকালীর পাট ছাড়াই নি—"

বাতাসের সজল সুরে শব্দটা প্রায় মিশে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু ভাব্‌লেন, 'তবে কি সত্যই চালদাপুরের জঙ্গলের পূবে—?'

তিনি মাথা নিচু ক'রে চলেছেন। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ বার দুই পেঁচার ডাক শুন্‌তে পেলেন ; একটা কাছে, আর একটা তা'র একটু দূরে। পেঁচা রাতের বেলাতেই ডাকে। এতে আর ভয়ের কি ?

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই একটা সুতীক্ষ্ণ শিষের শব্দে ডাক্তারবাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন! শব্দটা বাতাসে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে, ডালের ফাঁক দিয়ে, বনের তলা দিয়ে, গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ দূর থেকেও শিষ ভেসে আসছে। আবার একটা পেঁচা ডেকে উঠ্‌ল।

ডাক্তারবাবু হাঁক্‌লেন, "এই বুনো, দাঁড়া——"

বুনো ফিরে দাঁড়াল।

—"কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্?"

—"না কর্তা—"

আবার দূর থেকে শিষ ভেসে এল। ডাক্তারবাবুর এবার আর সন্দেহ রইল না। তিনি বত্রিশ বছর ডাক্তারী কর্‌ছেন—এ পথেও বার কয়েক এসেছেন, অবশ্য দিনের বেলা। কিন্তু এ রকমটা কখনও হয় নি। নিশ্চয়ই আজ তিনি টিয়ার হাতে পড়েছেন। বল্‌লেন, "এই বুনো—"

কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হ'তেই পাশের জঙ্গল থেকে দুটি ছায়ামূর্তি এসে সজোরে তাঁর হাত দু'খানা চেপে ধর্‌লে।

বুনোও তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে উঠ্‌ল, "খবরদার! স'রে দাঁড়া। কেউ ওর গা ছুঁবি নে—"

লোক দুটো চট্ ক'রে স'রে দাঁড়াল।

বুনো হারিকেনটা ওপর দিকে তুলে বল্‌লে, "কর্তা, সঙ্গে কি আছে? বার করুন।"

ডাক্তারবাবু বুনোর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"একটা ঘড়ি আর চেন, কয়েক আনা পয়সা, চশমা জোড়া—"

বুনোর মাথায় তখনও ওযুধের বাক্‌সটা ছিল। সে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"আর কিছু নেই—?"

—"হরি ডাক্তার মিছে কথা বলে না—"

—"এই বিচ্ছু, বাক্‌সটা ধর্! বুড়োটার কাপড়-চোপড় তল্লাস কর্‌ব।"

বিচ্ছু বাক্‌সটা বুনোর মাথা থেকে নিজের মাথায় তুলে নিতেই, বুনো ডাক্তারবাবুর সাম্‌নে এগিয়ে এল!

হরি ডাক্তার বল্‌লেন, "তুই বুঝি টিয়া?"

—"হ্যাঁ গো মশাই। এইবার দাও তো সঙ্গে কি আছে—"

হরি ডাক্তার চেনটা বুক থেকে খুলে, ঘড়িটা বুক পকেট থেকে বা'র ক'রে, টিয়ার হাতে দিতে দিতে বল্‌লেন, "এ সবে তোর কি হবে? বেচ লে দশটা টাকাও পাবি না।"

—"ঐ সঙ্গে তোমার জানটাও খা'ব—"

—"তা'তে কি লাভ হবে? যে লোকটার চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছি মাঝ থেকে সে-ই মারা যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর্। আমি রোগী দেখে ফিরে আসি; সেখানে যে টাকাগুলো পা'ব সেগুলো আর এই সব তোকে দিয়ে যা'ব—"

—"ওরে বংশী, বুড়োটার রগড়ের কথা শোন্। প্রাণ দিতে কেউ ফিরে আসে? ঐ ক'রে পালাতে চাও যাদু?"

—"পালাবার হ'লে এ জঙ্গলে রাতের বেলা ঢুক্‌তাম না। ছাপ্পান্ন

বছর বেঁচেছি, আরও দু'চার বছর না বাঁচ্‌লে ক্ষতি কি? ছেলেটা ছিল সেটাও তো মারা গেছে—!"

—"তবে আর দেরী কেন? এখনই মর"—ব'লেই টিয়া তা'র হাতের মোটা লাঠিখানা তুল্‌লে।

—"দেখ্‌ টিয়া, যমের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আমার বড় আনন্দ হয় রে। ওটা আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। একবার রোগীটাকে দেখ্‌ব। যদি আমার কথা কিছু শুনে থাকিস্‌, তা' হ'লে এটাও নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেয়েছিস্‌, 'হরি ডাক্তারের যে কথা সেই কাজ।' আমি ঠিক ফিরে আস্‌ব—"

টিয়া কি যেন একটু ভাব্‌লে; তারপর বল্‌লে, "আচ্ছা, আমি তোমায় এখান থেকে ডুলিতে চড়িয়ে তুলসীপুর নিয়ে যা'ব। সেই ডুলিতেই আবার ফিরে আস্‌বে! কিন্তু খবরদার! আমার যদি কোন ক্ষতি হয়, আর যদি ফিরে না আস, তা' হ'লে তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, তোমায় খুন ক'রে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌ব। কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না—"

হরি ডাক্তার খুব সহজ স্বরে বল্‌লেন, "আচ্ছা—"

—"ওরে বংশী ডুলি আন্‌। হীরু আর মদ্দাকেও ডেকে আন্‌বি—"

মিনিট দশেকের মধ্যেই একখানা ডুলি এল। ডাক্তারবাবু তা'তে উঠে বস্‌লেন। বেহারা হলো বিচ্ছু, বংশী, হীরু আর মদ্দা; টিয়া নিলে হাতে হারিকেন, মাথায় ওষুধের বাক্‌সটা।

জল-কাদা ভেঙ্গে ডাক্তারবাবুকে কাঁধে নিয়ে বাহকরা ছুটে চল্‌ল। তাদের গলা থেকে একটানা শব্দ বা'র হচ্ছে—"উহু—হুঁ—হুঁ—উহু—হুঁ—হুঁ—"

আবার বৃষ্টি পড়্ছে; দূরে শিয়াল ডেকে উঠ্‌ল। ডাক্তারবাবু চুপ্ ক'রে ব'সে ভাব্‌ছেন, "এ মন্দ নয়। গল্পে শুনেছি, ভূতের ওঝারা ভূতের পাল্কী চ'ড়ে বেড়ায়। আর আমি ডাক্তার হয়ে চলেছি ডাকাতের ডুলিতে!"

তারপর, রাত তখন বারোটা হবে! জঙ্গলটা শেষ হয় আর কি— এমন সময়ে হঠাৎ চারধার থেকে মশাল ও বন্দুক হাতে একদল লোক ডাক্তারবাবুর ডুলি ঘিরে ধ'রে হাঁক্‌ল—"এই খাড়া রহো—"

বাহকরা স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। হরি ডাক্তার ডুলি থেকে মুখ বা'র ক'রে দেখেন, সাম্‌নে দারোগা সাহেব। তাঁর হাতে পিস্তল।

দারেগা সাহেব হরি ডাক্তারকে দেখেই বল্‌লেন, "তাজ্জব ব্যাপার! ভেবেছিলাম, ডুলিতে টিয়া বেটা বউ সেজে পালাচ্ছে, তার বদলে আপনি?"

—"হাঁক শুনে আর মশালের আলো দেখে আমারও বুক কাঁপ্‌ছিল। ভাবছিলাম, বুঝি ডাকাতটার হাতে পড়্‌লাম, এখন দেখ্‌ছি আপনি—"

—"আপনার সাহস আছে তো ডাক্তারবাবু! এই রাত্রে জঙ্গল ভেঙ্গে চলেছেন কোথায়?"

—"তুলসীপুর, সতীশ মণ্ডলের বাড়ি। আপনি এখানে যে?"

—"খবর পেয়েছি, বেটা এখন এই জঙ্গলে আছে। আপনার ডুলি কোথাকার?"

—"সাতগড়ের—"

—"পাল্কীতে এলেন না কেন ?"

—"পাওয়া গেল না !"

—"বটে ! আপনার ডুলির বেহারাগুলোর চেহারা কিন্তু ভাল নয়। যেটার মাথায় বাক্সটা আছে সেটা ঠিক—"

ডাক্তারবাবু দারোগাসাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"কোন্ দিন হয়তো বল্‌বেন, আমার চেহারাটাও খুনীর মতো—"

দারোগা সাহেব হাঁক্‌লেন—"এই জমাদার! ডাক্তারবাবুকে যানে দেও। নমস্কার—!"

"নমস্কার।" ডাক্তারবাবু হাঁক্‌লেন—"ওরে শশী! পা চালিয়ে চল্। বেটারা এখানেই রাত কাবার কর্‌বি ?"

বেহারারা এবার আরও জোরে শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল—"উহু—হুঁ—হুঁ—ও ; উহু—হুঁ—হুঁ—ও!"

তাদের পা আরও জোর চল্‌ছে।

তারপর তা'রা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যখন তুলসীপুর সতীশ মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত ঠিক একটা। চারধার নিঝুম, কেবল দূর থেকে চৌকিদারের হাঁক ভেসে আস্‌ছে। মণ্ডল মশায়ের বৈঠকখানার বারান্দায় ব'সে কে যেন 'ফুড়ুৎ' 'ফুড়ুৎ' শব্দে হুঁকো টান্‌ছিল। তা'র সাম্‌নে একটা হারিকেন জ্বল্‌ছে। বারান্দায় এক কোণে একটা কুকুর শুয়েছিল। বেহারারা ডুলিখানা অন্ধকার উঠোনে নামাতেই কুকুরটা 'ঘেউ ঘেউ' কর্‌তে কর্‌তে উঠে দাঁড়াল। যে লোকটা হুঁকো টান্‌ছিল, সে বল্‌লে—"কে এল ?"

বংশী বল্‌লে—"সাতগড়ের ডাক্তারবাবু—"

লোকটা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ভিতর-বাড়ির দিকে চ'লে যেতেই ডাক্তারবাবু ডুলি থেকে বেরিয়ে এলেন।

টিয়া হঠাৎ তাঁর কাদামাখা পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"কর্তা! আপনি আমার মা-বাপ। এই পা ছুঁয়ে কিরে ক'রে গেলাম, আমার জান্ থাক্‌তে কেউ আপনার ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। ওরে বংশী, এই মদ্দা, তোরা দেবতার পায়ের ধূলো জিভে মাথায় ঠেকা—"

ইতিমধ্যে মণ্ডলমশায় বেরিয়ে এলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টিয়ার দলও হাওয়া।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু সাতগড়ের নিজের বৈঠকখানার বারান্দায় জলচৌকির ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছেন। দুপুরে তুলসীপুর থেকে আস্‌বার পথে শুনেছিলেন, পুলিশ চালদাপুরের জঙ্গলে টিয়ার আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; কিন্তু কারুকে ধর্‌তে বা কিছুই উদ্ধার কর্‌তে পারে নি। তিনি নিজের মনে ব'লে উঠলেন—"বেটা বাহাদুর!"

এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকার উঠোনের ওপর দিয়ে এসে তাঁর জলচৌকির সাম্‌নে একজোড়া বড় ইলিশ মাছ ও চারটে আনারস রেখে মাটিতে ঢিপ্‌ ক'রে মাথা ঠুকেই মিলিয়ে গেল।

এটা চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। এখন সে ডাক্তারবাবু বা টিয়া কেউ-ই নেই। কিন্তু চালদাপুরের জঙ্গলের খানিকটা আছে। সেখানে গেলে শিবকালীর পাট আজও দেখা যায়।

মৌটুস্‌কী—

হরিশবাবুর নাত্‌নী মৌটুস্‌কী বল্‌লে, "দাদু, কাঁধে চড়বো।"

নাতি-নাতনীরা দাদুর কোলে-কাঁধে উঠেই থাকে। তবে পিঠে চড়ে না। কারণ, দাদুদের কোমরে সাধারণত বাত। তাই সাধ থাকলেও তাদের তাঁরা পিঠে বইতে পারেন না।

তা' হরিশবাবু বুঝতে পারলেন, এরপর মৌটুসকী বল্‌বে, "মাথায় চড়বো।" তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, নাতনীটিকে তিনি বড়ই ভালোবাসেন। সেজন্যে সে কদাচিৎ তাঁর কোলে ওঠে, সচরাচর কাঁধেই চড়ে এবং তার একটু পরেই তাঁর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ মাথায় উঠে বসে। বসেই বলে, "আমি ছাদে উঠেছি।"

আচম্‌কা উঠবার সময়ে হরিশবাবুর ঘাড়ে এক একদিন লাগে। লাগ্‌লে মনে রাগ ও দুঃখ দুই-ই হয়। কিন্তু তিনি দুটির একটিও প্রকাশ করতে পারেন না। একে তো ঐ একটি মাত্র নাত্‌নী। তার ওপর তিনি তাকে এত ভালবাসেন যে, তার বাপ-মার দেওয়া নাম 'মধুমঞ্জরী' ফেলে দিয়ে নিজের পছন্দমতো দেওয়া 'মৌটুস্‌কী' নামে ডেকে থাকেন। এর ওপর আবার তাঁর মেয়েটির ভারি অভিমান। রাগ প্রকাশ করলে হয়তো তখনই বলে বসবে, "মেয়ের মেয়ে কিনা! তাই বাবা ওকে দেখ্‌তে পারে না।" অথচ হরিশবাবুর আর ছেলে-মেয়ে নেই। দাদু হওয়ার ঠেলা বিষম!

হরিশবাবু তখন টাকে ঘষে ঘষে টাকারি তৈল মাখছিলেন, চুল গজাবার জন্যে নয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখবার উদ্দেশ্যে। তাই বললেন, "এখন তেল মাখছি, টুস্‌কীমণি। এখন কাঁধে চড়লে তোমার ইজেরে যে তেল লেগে যাবে। মা বকবে।"

টুস্‌কীমণি বললে, "তুমিও মাকে বকে দেবে। তুমি তো মায়ের বাবা।"

"বাবা হলেই মেয়েকে বকতে হয় কি?"

"হুঁ। বাবা তো আমায় বকে। আমি তোমার কাঁধে চড়বো।" বল্‌তে বল্‌তে মৌটুস্‌কী হরিশবাবুর কাছে এগিয়ে এল।

হরিশবাবু বল্‌লেন, "আমায় ছুঁয়ো না।"

"ছুঁলে কি হয়? এই তো ছুঁলুম।" বলেই মৌটুসকী হরিশবাবুর একেবারে টাকে হাত বুলিয়ে দিলে।

পাশে একখানি ভিজে গামছা পড়ে ছিল। হরিশবাবু বল্‌লেন, "ঐ গামছায় হাতে মুছে ফেল। যে তেল মাখে তাকে ছুঁলে গায়ে তেল লেগে যায়।"

"তেল লাগলে কি হয়?"

"গা নোংরা হয়।"

"তবে তুমি তেল মেখে গা নোংরা করলে কেন?"

ঘরে ছোট ছেলে-মেয়ে, বিশেষ করে মৌটুস্‌কীর মতো মেয়ে থাকা মানে আদালতের কাঠগড়ায় বাস করা। এ মেয়ে বড় হয়ে উকীল কি ব্যারিস্টার না হয়ে যায় না। তবুও তাকে ভোলাবার জন্যে বল্‌লেন, "দেখে এসো তো মণি তোমার টিয়াপাখীটা কি করছে।"

মৌটুস্‌কী তৎক্ষণাৎ বল্‌লে, "কি আবার করবে? ছোলা খাচ্ছে। নাও—আমায় কাঁধে চড়াও। নাহলে আমি এখুনি কাঁদবো।"

হরিশবাবুর মৌটুস্‌কীর কান্না! সে যে কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড তা যে না দেখেছে তাকে বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না।

হরিশবাবু একটু শক্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা! তুমি দাঁড়াও। আমি চট্ করে মাথায় দু' মগ জল ঢেলে আসি।"

"আমাকে কাঁধে নিয়েই মাথায় জল ঢালবে চল।"

"সে কি করে হবে, টুস্‌কীমণি? তাতে আমারও নাওয়া হবে না, তোমারও গায়ে জল লাগবে।"

"লাগুক গে। আমি কাঁধে চঁড়বোঁ"—বলতে বলতে তার ভোঁতা নাক আর পুরু ঠোঁট ফুলতে লাগ্‌লো।

হরিশবাবু এবার মহাসঙ্কটে পড়লেন। তাঁরই আদরে গড়া মৌটুস্‌কী। তিনিও প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লেন, "তবে এস। শক্ত হয়ে বসে থেকো। তেলে কাঁধ পিছল হয়ে আছে।"

ওপরে উঠলেই সর্বদাই পড়বার ভয়। তাই আসন আঁকড়ে থাকা দরকার।

ঠিক সেই সময়ে হরিশবাবুর মেয়ে রান্নাঘর থেকে কলে এল হলুদমাখা হাত ধুতে; বললে, "বাবা, তুমি ওকে কাঁধে নিয়েই নাইতে যাচ্ছো? এত আদর ভাল নয়।"

বাবা হওয়ারও কি ঝক্‌মারী! সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেও হয়তো মেয়ে ঐ কথাই বল্‌তো।

মেয়ে আবার বললে, "তোমার আদরে আদরে ও একেবারে বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আমাদের কথা পর্যন্ত কেয়ার করে না!"

মায়ের বাবার কথাই যে কেয়ার করেনি সে মায়ের কথা কেয়ার করতে যাবে কেন?

তার মা এবার ধমক দিয়ে বল্‌লে, "এই! নাম্—নেমে আয়। বাবা, শয়তানটাকে নামিয়ে দাও।"

কিন্তু যাকে নামাবার এত চেষ্টা সে হরিশবাবুর কাঁধে বসে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে "আঁ—আঁ" করে কাঁদতে লাগ্‌লো। হরিশবাবুর তৈলাক্ত বুকে তার কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়লো।

হরিশবাবু মিনতির সুরে বল্‌লেন, "আহা! ও থাক্ মা, থাক্। ওকে নিয়ে নাইতে আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। না, তুমি কেঁদো না, টুসুমণি। চল—চল—আমরা নেয়ে আসি।"

মা কলে হাত ধুয়ে গর্‌তার্ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল।

হরিশবাবু বললেন, "দেখলে লো দাদুমণি, মা কি রকম রেগে গেছে? তোমার জন্যে আমায়ও বকলে।"

দাদুমণির কান্না কতকটা হাতধরা। তাই দিব্যি শান্তসুরে বললে, "তুমি কেন মাকে বকলে না?"

কথাগুলি শুনে হরিশবাবু একটু হাসলেন; বললেন, "তুমি গামছাখানা ধর।"

"না, আমায় নামিয়ে দাও। তুমি নেয়ে আবার আমায় কাঁধে নেবে। কেমন?"

"আবার ? আচ্ছা।" বলে হরিশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের কাঁধে চড়ে সেই বুড়োটার বেড়ানোর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। আহা! বেচারী সিন্ধুবাদ।

তিনি নেয়ে এসে দেখেন মৌটুস্‌কী তার মায়ের তৈরী ন্যাকড়ার মস্ত পুতুলটা আর খাঁচাশুদ্ধ তার টিয়া পাখিটা নিয়ে বসে আছে। দেখে হরিশবাবুর বড় আনন্দ হলো ; বললেন, "বাঃ! লক্ষী সোনা আমার। ওদের নিয়ে খেলা কর। তোমার খুকুকে ঘুম পাড়াও, টিয়াকে রাধাকেষ্ট বল্‌তে শেখাও।"

টুস্থমণি বললে, "না—না—ও সব না। এরা তোমার কাঁধে বড়বে।"

হরিশবাবু এবার সত্যিই একটু উত্যক্ত বোধ করলেন ; একটু রুক্ষ ভাবে বললেন, "এবার দুষ্টুমী হচ্ছে। যাও—ভাত খাও গে।"

"না—খাবো না। এদের কাঁধে চড়াও।"

এই বিপদে হরিশবাবুকে রক্ষা করলে তাঁর মেয়ে। সে ঘরে ঢুকেই বললে, "বাবা, তোমার ভাত বাড়ি ?"

"বেশ। টুস্থমণি খাবে না ?"

"ও কি তোমার অপেক্ষায় বসে আছে ? তেমন মেয়ে কি না! এই বয়সেই ভারি স্বার্থপর হয়ে উঠ্‌ছে। এই, যা ও ঘরে গিয়ে ঘুমোগে —ওঠ্‌। এ সব কেন এনেছিস্ ?" বল্‌তে বল্‌তে মা তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে পুতুল আর পাখিটা তুলে নিয়ে বল্‌লে, "আয়। চল্।"

টুস্থমণি কাজলপরা গোল গোল চোখ দুটো দাদুর মুখে একবার তুলেই মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আহারান্তে হরিশবাবু বিছানায় বসে তামাক টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন, দিন কয়েক কাশীতে ডুব দিলে কেমন হয়? মুনি-ঋষিরা ভারি বিচক্ষণ ছিলেন। এই সব দেখে-শুনেই তাঁরা বুড়োদের জন্যে বনবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। একালে তেমন বন-জঙ্গল নেই যে একটু আরাম করে থাকা যায়। সব কেটে-কুটে সাফ করে ফেলছে বলে বুড়োদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে কাশীবাসের। টুস্থমণির দিদিমা থাকতে একবার তো তিনি কয়েকদিনের জন্যে কাশীতে ডুব দিয়েছিলেন। তখন চাকরিতে ছিলেন। কিন্তু ডুব দিয়ে কি পার পাবার যো ছিল! ওর দিদিমা সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিল। এখন পেন্‌সন্ পাচ্ছেন। এবার টুস্থমণির জন্যে দিন কয়েক ডুব দেবেন। সত্যি তো! তাঁর জন্যে মেয়েটা যদি বেয়াড়া হয়ে ওঠে তবে ওর বাপ-মাকেই দুঃখ পেতে হবে যে। তাঁর আর কি! তিনি তো দু' দিন বাদেই চোখ বুজবেন। তাঁর ঘণ্টা তো অনেক দিনই বেজে গেছে। এতো ছুটির পরও ক্লাস করার মতো। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হরিশবাবু শুয়ে পড়লেন। বুড়ো মানুষ হলেও তাঁর ঘুম কিছু গাঢ়। শুতে-শুতেই ঘুম এসে গেল।

তারপর এক সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখেন, পাশে বিছানায় খাঁচাশুদ্ধ মৌটুসকীর টিয়া পাখিটা আর কানের ওপর একটা বালিশ—না—না—ন্যাকড়ার পুতুলটা। সেই সঙ্গে শুনলেন, খিল্ খিল্ হাসিশব্দ।

না, আর নয়। হরিশবাবু সংকল্প করলেন, দিন কয়েক কাশী

গিয়েই থাকবেন। যদিও বাড়িখানি তাঁর তবুও এ বাড়ি এখন ছাড়াই দরকার। তিনি উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিয়ে খট্ খট্ করতে করতে চোখ-মুখ ধুতে গেলেন।

তার দু'দিন পরেই হরিশবাবু চললেন কাশী। দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিতে তাঁর বিছানা-ট্রাংক-হুঁকো-ঘটি-ছাতি উঠেছে, উঠ্তে বাকি কেবল, হরিশবাবু আর তাঁর মকরমুখো লাঠিখানি। মনটাকে আর টুস্থমণিকে তিনি কিছুতেই বাগে আনতে পারছেন না। মনকে ভেতর থেকে ঠেলা দিয়ে বলছেন, "কাশী চল্।" মন বলছে, "ইচ্ছে করছে না।" আর টুস্থমণি দু হাতে তাঁর গলা আঁকড়ে ধরে বলছে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।" তার বাবা ডাকছে, মা ডাকছে। সে কারো কথা শুনছে না; বলছে "আমি কাশী যাবো।" হরিশবাবু মনকে যদি বা রাজী করালেন টুস্থমণিকে আর কোল থেকে নামাতে পারেন না। সে কিছুতেই বাগে আসে না; কেবল বলে, "আমি দাদুর সঙ্গে যাবে। না—না—তোমরা থাকো। আমি যাবো।"

তার মা বললে, "দাদু আবার ফিরে আসবে। তুমি আমার কোলে এস। এস তো মঞ্জুমণি—"

"না—না—তোমার কোলে যাবো না। আমি আবার ফিরে অসবো।"

হরিশবাবু তখন হতাশ হয়ে বললেন, "কাশীনাথ আমার মাথায় থাকুন। ট্যাক্সি থেকে মোট-ঘাট নামাতে বল।"

অগত্যা সব নামানো হলো। শিখ ড্রাইভার বী[illegible]জের সঙ্গে কটু কথা বল্তে বল্তে গাড়ি নিয়ে গেল চলে।

হরিশবাবু নাতনীকে কাঁধে নিয়ে আবার নিজের ঘরে ঢুক্‌লেন।

তারপর থেকে আবার আগের মতোই হরিশবাবু ও মৌটুস্‌কীর দিন কাটতে লাগ্‌লো। তবে মৌটুস্‌কী মাঝে মাঝে বলে, "কাশী যাবে না দাদু? চ'ল।"

হরিশবাবুও উত্তরে বলেন, "যাবো বৈকি দিদি।"

শেষে সত্যিই একদিন তিনি টুস্থমণিরও ছোট হাত দুখানির বন্ধন ছাড়িয়ে তার নাগালের বাইরে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। টুস্থমণির বায়না-আবদারের জন্যে রইলো না আর কেউ।

তবুও স্বভাব কি সহজে যায়? তার মা তার বায়না-আবদারে এক একদিন জ্বালাতন হয়ে ঘা কতক দেয় ঢিপিয়ে। মধুমঞ্জরী মানে হরিশবাবুর মৌটুস্‌কী তখন দাদুর শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে বসে কাঁদে।

বেচারী! অত মধু আর কি কারো কাছে কোন দিন সে পাবে?

গণেশচন্দ্রের অশুভ যাত্রা

গণেশচন্দ্র যাচ্ছিল দিদির বাড়ি।

মা বল্‌লেন—"খুব সাবধান বাবা। গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকো না, সালতির ধারে ব'সো না—"

গণেশ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না মা ; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

—"এই তোমার দিদির জন্যে আট গণ্ডা নাড়ু, একখানা আমসত্ব, সের দুই গুড়, আর আটখানা চন্দ্রপুলী দিলাম। সে চন্দ্রপুলী খেতে ভালবাসে ; সেইজন্যে ক্ষীরের ভাগ এতে বেশি আছে। তুমি এ থেকে কিছু খেয়ো না। তোমার জন্যে সব আলাদা দিয়েছি। একই পোঁট্‌লায় রইল বুঝ্‌লে ?"

গণেশ বহু কষ্টে জিভের জল সাম্‌লে নিলে ; উত্তরে শুধু ঠোঁট চেপে বল্‌লে—'হুঁ"। "হাঁ" বল্‌লে ঠোঁট দু'খানা ফাঁক হ'য়ে যেত। তা' হ'লেই জিভের জল ঠেকান যেত না।

গণেশের এক হাতে জামা-কাপড়ের পোঁট্‌লা, আর এক হাতে আমসত্ব-চন্দ্রপুলী প্রভৃতির পোঁট্‌লা। খাবারগুলো মা কচি কলাপাতা দিয়ে মুড়ে একখানা পরিষ্কার কাপড়ে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে দিয়েছেন।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটে গাড়ি। বাড়ি থেকে রেল-স্টেশন প্রায় এক ক্রোশ। তখন উঠোনে সবে রোদ নেমেছে। একটু সকাল সকাল যাওয়া ভাল। গণেশ রওনা হলো। তার খালি পা, গায়ে একটা কালো ডোরাদার ছিটের কোট। কোঁচার ওপর খুঁটে বাঁধা যাতায়াতের পথ খরচ সাড়ে চার টাকা।

মা বল্‌লেন—"দুর্গা, দুর্গা। পথে কোথাও দেরী ক'রো না বাবা!"

গণেশ খাবারের পোঁট্‌লাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্‌লে—"না মা!"

সোজা পথ। গণেশ চলেছে। কিছুদূর গিয়ে মাণ্টুর সঙ্গে তা'র দেখা। মাণ্টু ডাক্‌লে—"এই গণশা? কোথায় যাচ্ছিস্ রে?"

গণেশ বল্‌লে—"খবরদার! পিছু ডেকো না।"

—"নিশ্চয় ডাক্‌ব। এই তোর্ পিছনে গিয়ে ডাক্‌ছি"—বল্‌তে বল্‌তে মাণ্টু গণেশের পিছনে স'রে গিয়ে ডাক্‌লে—"এই গণ্‌শা—!"

গণেশ পোঁট্‌লা দুটো রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে মাণ্টুকে তাড়া কর্‌লে। পথের ধারে ঘোষেদের রোগা এঁড়েটা তখন ঘাস খাচ্ছিল। সে খাবারের পোঁট্‌লাটার কাছে গুটি-গুটি স'রে গিয়ে তা'র গন্ধ শুঁক্‌লে। কচি কলাপাতা, গুড় ও আমসত্বের গন্ধে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

গণেশ তখন মাণ্টুকে ধরে ধরে। সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একবার পোঁট্‌লা দুটোর দিকে ফিরে দেখ্‌লে। দেখেই তা'র আক্কেল গুড়ুম! মাণ্টুকে ধরা হ'ল না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে ছুট্ দিলে; ছুট্‌তে ছুট্‌তে চেঁচাতে লাগ্‌ল—"হেই—হ্যাট্—হ্যাট্—"

এঁড়েটা ততক্ষণে পোঁট্‌লাটা চিবতে আরম্ভ করেছে। গণেশের তাড়ায় তা'র ভ্রূক্ষেপ নেই—দিব্যি লেজ নাড়্‌ছে আর পোঁট্‌লা চিবচ্ছে। পথের ধারে একখানা বাঁশের আগা পড়ে ছিল। গণেশ ছুটে এসে সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে এঁড়েটার পিঠে মার্‌লে এক ঘা। এঁড়েটার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেল। সে পোঁট্‌লাটা ছেড়ে লেজ তুলে দিলে ছুট্।

গণেশ তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে পোঁট্‌লাটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলে; মনে মনে বল্‌লে—"এঃ! সবগুলো বোধ হয় নষ্ট হ'য়ে গেছে। মাণ্টু বাঁদরটাই যত নষ্টের গোড়া! পিছু ডেকে এই কাণ্ড!—না, না, খাবারগুলো ঠিক আছে। এঁড়েটা কেবল পোঁট্‌লাটার গেরোটা চিবচ্ছিল।" সে একবার এঁড়েটার দিকে, একবার মাণ্টুর দিকে তাকালে। এঁড়েটা তখন নিশ্চিন্তমনে মুখুয্যেদের বেড়ার ধার থেকে পুঁইগাছের একটা কচি নরম ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে; আর, মাণ্টু বাঁদর তাদের বাগানের বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—"গণ্‌শা—এই গণ্‌শা—"

গণেশ পোঁট্‌লা দুটো দু' হাতে তুলে নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—"আমি এসে এর শোধ তুল্‌ব।"

মাণ্টু বল্‌লে—"আচ্ছা—।"

গণেশ আর কিছু বল্‌লে না।

পাড়াটা বেশি বড় নয়। তা'র পরই মাঠ। পথটা গেছে মাঠের মাঝ দিয়ে। গণেশ তখনও হাঁপাচ্ছে। মাণ্টুর পিছনে তাড়া কর্‌তে গিয়ে কিছু দেরী হ'য়ে গেল। গাড়িখানা না চ'লে যায়। সে হন্‌-হন ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল।

পাড়া শেষ হ'য়ে গেল; সামনে দুপাশে মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে পৌঁছলে একটু বাঁ-ধারে স্টেশন দেখা যাবে।

খাবারের পোঁট্‌লাটা বড় ভারী। সে একবার হাত বদ্‌লে নিলে; শেষে জামা-কাপড়ের পোঁট্‌লাটা হাতে ঝুলিয়ে খাবারে পোঁট্‌লাটা ঘাড়ে নিয়ে চল্‌তে লাগল কিন্তু ঠিক নাকের কাছেই এমন টাট্‌কা খাবারগুলো!

চমৎকার গন্ধ নাকে লাগ্ছে। সে মনে মনে বল্লে—'মা দিদিকেই বেশি ভালবাসে। যা' কিছু দিদির জন্যে। আমার জন্যে কেবল—'

হঠাৎ পিছনে শব্দ হ'ল—টক্-টক্। সে ফিরে দেখে, হরচন্দর ডাক্তার ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্তে আস্তে জিভ দিয়ে শব্দ ক'রে ঘোড়াকে তাড়া দিচ্ছেন। ছোট ঘোড়া; ডাক্তারের পা-দু'খানা মাটিতে প্রায় ঠেকে-ঠেকে। ঘোড়াটার মুখে দড়ির লাগাম; পিঠে কম্বলের উপর ছেঁড়া জিন; কিন্তু রেকাব জোড়া ঠিক আছে। ডাক্তারবাবু গণেশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"কিরে গণ্শা! কোথায় যাচ্ছিস্?"

—"দিদির বাড়ি।"

—"শীগ্গির যা, না হ'লে গাড়ি পাবি না—" ব'লে তিনি কোটের পকেট থেকে 'রস্কো'-মার্কা ঘড়ি বা'র ক'রে সময় দেখ্লেন। ঘড়িটাকে একটা ছোট ক্লক বল্লেই চলে। ঘড়িটা নিকেল-করা লোহার চেনে বাঁধা। একবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন ব'লে সোনা বা রুপোর চেন ডাক্তারবাবু আর ব্যবহার করেন না। ঘড়ি দেখে তিনি বল্লেন—"আটটা বাজ্তে আর এগার মিনিট বাকী। পূবের গাড়িতে যাবি ত?"

—"হুঁ।"

—"তবে জোরে হাঁট্। গাড়ি দু'একদিন আগেও আসে"—ব'লে ডাক্তারবাবু ঘোড়ার পিছনে পিড়িক ক'রে খেজুর ডালের ছিপ্টি মার্লেন। ঘোড়াটাও অম্নি ছুট্বার চেষ্টা কর্লে, কিন্তু পার্লে না; তবুও গণেশকে ছাড়িয়ে চ'লে গেল।

গণেশও আরও তাড়াতাড়ি হাঁট্ছে। সে ঘাড়ে খাবারের পোঁট্লাটা এক হাত দিয়ে ধ'রে আছে। তাতে হাত ও ঘাড় ব্যথা হ'য়ে গেল; পোঁট্লাটা ভারী ঠেক্ছে। ঝাঁকি লেগে চন্দ্রপুলীগুলো বোধ হয় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। দিদি ভাব্বে সে বুঝি ভেঙ্গে খেয়েছে। আচ্ছা, স্টেশনে গিয়ে খুলে দেখবে। এত ভারী—টান্তেও কষ্ট হচ্ছে। সময় থাক্লে কিছু ভার কমিয়ে ফেল্বে। তার ভাগের গুলো খেয়ে ফেল্লেই হলো। দিদির খাবারগুলো সে কিছুতেই খাবে না। কিন্তু গাড়ি—ঐ যে সিগ্ন্যাল দেখা যায়, এখনও ডাউন করে নি। আর তো আধ ক্রোশের কম।

সে দেখ্লে হরচন্দর ডাক্তার পথ থেকে মাঠে নেমে পশ্চিমদিক্ ধর্লেন। ঐ দিকের গাঁয়ে তিনি রোগী দেখ্তে যাচ্ছেন। ঘোড়াটা এবার টকাস্-টকাস্ ক'রে ছুট্ছে। ডাক্তারবাবু পা দু'খানা ফাঁক ক'রে সোজা হ'য়ে ব'সে আছেন। গণেশ একমনে তাঁকে দেখ্ছিল। হঠাৎ তা'র চোখ পড়্ল সাম্নে সিগ্ন্যালের দিকে। ও কি! ডাউন! সিগ্ন্যাল ডাউন হয়েছে! এখনও যে সিকি মাইল।

গণেশ ছুট্ল। সে কাঁধ থেকে খাবারগুলো নামিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিলে। ঐ যে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। পূবের মাঠ দিয়ে আরও একজন কে দৌড়চ্ছিল। সেও বোধ হয় ঐ গাড়িতে যাবে।

গণেশ সকালে ঘি, আলু-ভাতে আর দুধ দিয়ে এক পেট ফেনভাত খেয়েছে। সেগুলো এখন পেটের ভিতর ঢকস্ ঢকস্ কর্ছে। সে আর ছুট্তে পার্ছে না; এর মূল হলো,—মাণ্টু উল্লুকটা। সে যদি না

পিছু ডাক্‌ত, তা' হ'লে দেরী হতো না। গাড়ি মিস্‌ কর্‌লে ফিরে গিয়ে সে তা'র মাথা ভাঙ্গবে—উল্লুক, বাঁদর, ছাগল—!

গাড়িখানা হু-হু শব্দে ছুটে আস্‌ছে। ঐ যে ইন্‌জিন। ইন্‌জিনখানা একবার সাদা ধোঁয়া ছাড়্‌লে; হুইস্‌ল দিলে। আর পাঁচ মিনিট দৌড়লে সে স্টেশনে এসে পড়্‌বে। এখনও উপায় আছে; গাড়ি মামুদপুরের গুমটি ছাড়ায় নি।

গণেশ প্রাণপণে ছুট্‌ছে; মাঠের লোকটাও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌ছিল। তা'র এক হাতে একটা ছোট টিনের বাক্‌স, আর এক হাতে পোঁট্‌লা।

দু'জনেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে স্টেশনে এসে পৌঁছল। গাড়ি তখনও আসে নি। তা'রা টিকিট-ঘরের জানালার বাইরে দাঁড়ালে; কিন্তু জানালা বন্ধ! জানালার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লে, টিকিট-বাবু একটা ঝাঁপের মত বড় খাতা খুলে একমনে তা'তে কি লিখ্‌ছেন। তাঁর মুখে জ্বলন্ত বিড়ি; গায়ে কালো কোট, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চেহারা দেখ্‌লে মনে হয়, তিনি কেবল উপোস করেন।

মাঠের সেই লোকটা ডাক্‌লে—"বাবু! টিকিট দিন্‌। গাড়ি এল—"

গণেশও ততক্ষণে পোঁট্‌লা দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে কোঁচার খুঁট খুলে টিকিটের দাম বা'র কর্‌ছে।

টিকিট-বাবু কিন্তু ফিরে তাকালেন না। লোকটা আবার বললে—"মাস্টারবাবু, টিকিট দিন—"

তা'র কথা শেষ হ'তে না হ'তে স্টেশন কাঁপিয়ে গাড়ি ছুটে এল। গণেশের বুক কেঁপে উঠ্‌ল। সে সরু গলায় চীৎকার ক'রে বল্‌লে—"টিকিট দিন—গাড়ি এল—"

টিকিট-বাবু এবার চোখ তুলে তাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না।

ইন্‌জিনখানা তখন হুঙ্কার দিতে দিতে ছুট্‌ছে। দু'জনে সেখান থেকে সভয়ে গলা বাড়িয়ে তা' দেখ্‌লে; তাদের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌ছে। কিন্তু না ভয় নেই—মালগাড়ি। গাড়িখানা যেন তাদের বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে স্টেশন পার হ'য়ে গেল।

স্টেশনের 'পানি পাঁড়ে' এতক্ষণ 'শেডের' সিঁড়ির ওপর ব'সে খৈনি ডল্‌ছিল; আর গুন্‌ গুন্‌ ক'রে ভজন গাইছিল 'আরে হনুমানজীকো—।' মাঠের লোকটা তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"পূবের গাড়ি চ'লে গেছে গো?"

পানি পাঁড়ে উত্তর দিলে না; আরও গম্ভীর হ'য়ে খৈনি ডল্‌তে লাগ্‌ল। গণেশ তা'র কাছে স'রে গিয়ে খাঁটি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলে—"জমাদারজী, পূবের গাড়ি চলে গিয়া হ্যায়?"

লোকটাও পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে—"কুথা যাবে?"

—"আমতলী—"

—"তব্‌ এখুন্‌ আস্‌বে—"

তা'র কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিকিটের ঘণ্টা পড়্‌ল।

গণেশ একবার ভাব্‌লে. পোঁট্‌লাটা খুলে দেখে। কিন্তু তা' হ'লে টিকিট কিনতে দেরী হবে। তা'র চেয়ে গাড়িতেই খুলে দেখ্‌বে ভেবে, সে টিকিট কর্‌তে গেল। সেই মাঠের লোকটাও তা'র পাশে দাঁড়িয়ে তা'কে ঠেলা দিচ্ছে। আরও জন দশ-বারো ষণ্ডা লোক জানালার কাছে এসে ভীড় জমালে। লোকগুলো এতক্ষণ কোথায় ছিল? শেডের

মধ্যে গণেশ কাউকে তো দেখে নি। সকলেই ঠেলাঠেলি করছে আর টিকিট-বাবুকে ডাক্‌ছে—"বাবু, ও বাবু।" গণেশ ছোট মানুষ; তাদের মধ্যে ডুবে গেছে। তা'র এক হাতে দুটো পোঁট্‌লা—চোরের ভয়ে বাইরে রেখে আস্‌তেও ভরসা পায় নি।

টিকিট-বাবু তখনও খাতা লিখ্‌ছেন। গণেশ ডিঙ্গি দিয়ে জানালায় মুখ দিয়ে বল্‌লে—"মশায়, ম'রে গেলাম—"

টিকিট-বাবু এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খাতা ছেড়ে উঠ্‌লেন; তারপর জানালার কাছে এসে কড়া মেজাজে বল্‌লেন—"কৈ হে! পয়সা দাও—"

গণেশ হাত গলিয়ে দুটো টাকা দিয়ে বল্‌লে—"আমতল-র হাফ-টিকিট—"

—"হাফ-টিকিট? তোর বয়স কত?"

—"সাড়ে এগার বছর।"

—"তা মনে হচ্ছে না তো!" বল্‌তে বল্‌তে তিনি টাকা দুটো বাজিয়ে একখানা টিকিট নিয়ে ঘটাং ক'রে আওয়াজ করলেন। তারপর বাকী পয়সা ও টিকিটখানা ফোকরের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

সেখানে তখন চার-পাঁচখানা কালো ও শক্ত হাত ঠেলাঠেলি করছে। গণেশ বহুকষ্টে তা'র মধ্যে হাত দিয়ে পয়সা ও টিকিটখানা কুড়িয়ে নিয়ে প্রায় লোকগুলোর পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল। এসে পয়সাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে, টিকিটখানা প'ড়ে দেখ্‌লে। ঠিক আছে—তৃতীয় শ্রেণী—রতনপুর হইতে আমতলী—ভাড়া ১৶১০ আনা।

গণেশ টিকিট ও পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে পেটের কাছে গুঁজে রাখ্‌লে।

ওদিকে টিকিট-ঘরে তখন ঘন ঘন আওয়াজ হচ্ছে—ঘটাং-ঘটাং, ঘটাং-ঘটাং। গাড়ি আস্‌তে আর দেরী নেই। টেলিফোনে টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে। স্টেশন-মাস্টার হঁক্‌লেন—"এ তেওয়ারী, সিগ্‌ন্যাল দেও—"

দেখ্‌তে দেখতে স্টেশনটা সরগরম হ'য়ে উঠ্‌ল। গেট খোলা হ'ল। গণেশ পোঁট্‌লা হাতে প্ল্যাট্‌ফরমে এসে দাঁড়ালো।

পশ্চিমদিক্‌টা রোদে ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। ঐ দিক্ থেকে গাড়ি আস্‌বে। গণেশ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ঐ যে কালো মতো ইন্‌জিন দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়্‌ল। গাড়িতে যাত্রী বেশি নেই। গণেশ তাড়াতাড়ি একখানা কামরায় উঠে পড়্‌ল। কামরাটা একদম খালি। সে পোঁট্‌লা দুটি বেঞ্চির ওপর রেখে জানালার ধারে বস্‌ল। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় সেই মাঠের লোকটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে দরজা ঠেলে কামরাটায় ঢুকে পড়্‌ল। ঠিক তখনই গাড়িও দিল ছেড়ে।

লোকটা গণেশের সাম্‌নের বেঞ্চির ওপর পোঁট্‌লা ও টিনের বাক্‌সটা রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—"টিকিট-বাবু একটা সিকি অচল দিয়েছিল, তা'র জন্যে এত দেরী। তুমি আমতলী যাবে?"

—"হুঁ—"

—"কা'র বাড়ি?"

মধ্যে গণেশ কাউকে তো দেখে নি। সকলেই ঠেলাঠেলি কর্‌ছে আর টিকিট-বাবুকে ডাক্‌ছে—"বাবু, ও বাবু।" গণেশ ছোট মানুষ; তাদের মধ্যে ডুবে গেছে। তা'র এক হাতে দুটো পোঁট্‌লা—চোরের ভয়ে বাইরে রেখে আস্‌তেও ভরসা পায় নি।

টিকিট-বাবু তখনও খাতা লিখ্‌ছেন। গণেশ ডিঙ্গি দিয়ে জানালায় মুখ দিয়ে বল্‌লে—"মশায়, ম'রে গেলাম—"

টিকিট-বাবু এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খাতা ছেড়ে উঠ্‌লেন; তারপর জানালার কাছে এসে কড়া মেজাজে বল্‌লেন—"কৈ হে! পয়সা দাও—"

গণেশ হাত গলিয়ে দুটো টাকা দিয়ে বল্‌লে—"আমতল-র হাফ-টিকিট—"

—"হাফ-টিকিট? তোর বয়স কত?"

—"সাড়ে এগার বছর।"

—"তা মনে হচ্ছে না তো!" বল্‌তে বল্‌তে তিনি টাকা দুটো বাজিয়ে একখানা টিকিট নিয়ে ঘটাং ক'রে আওয়াজ করলেন। তারপর বাকী পয়সা ও টিকিটখানা ফোকরের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

সেখানে তখন চার-পাঁচখানা কালো ও শক্ত হাত ঠেলাঠেলি করছে। গণেশ বহুকষ্টে তা'র মধ্যে হাত দিয়ে পয়সা ও টিকিটখানা কুড়িয়ে নিয়ে প্রায় লোকগুলোর পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল। এসে পয়সাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে, টিকিটখানা প'ড়ে দেখ্‌লে। ঠিক আছে—তৃতীয় শ্রেণী—রতনপুর হইতে আমতলী—ভাড়া ১৶১০ আনা।

গণেশ টিকিট ও পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে পেটের কাছে গুঁজে রাখ্‌লে।

ওদিকে টিকিট-ঘরে তখন ঘন ঘন আওয়াজ হচ্ছে—ঘটাং-ঘটাং, ঘটাং-ঘটাং। গাড়ি আস্‌তে আর দেরী নেই। টেলিফোনে টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে। স্টেশন-মাস্টার হঁক্‌লেন—"এ তেওয়ারী, সিগ্‌ন্যাল দেও—"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্টেশনটা সরগরম হ'য়ে উঠ্‌ল। গেট খোলা হ'ল। গণেশ পোঁট্‌লা হাতে প্ল্যাট্‌ফরমে এসে দাঁড়ালো।

পশ্চিমদিক্‌টা রোদে ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে। ঐ দিক্‌ থেকে গাড়ি আস্‌বে। গণেশ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ঐ যে কালো মতো ইন্‌জিন দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়্‌ল। গাড়িতে যাত্রী বেশি নেই। গণেশ তাড়াতাড়ি একখানা কামরায় উঠে পড়্‌ল। কামরাটা একদম খালি। সে পোঁট্‌লা দুটি বেঞ্চির ওপর রেখে জানালার ধারে বস্‌ল। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় সেই মাঠের লোকটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে দরজা ঠেলে কামরাটায় ঢুকে পড়্‌ল। ঠিক তখনই গাড়িও দিল ছেড়ে।

লোকটা গণেশের সাম্‌নের বেঞ্চির ওপর পোঁট্‌লা ও টিনের বাক্‌সটা রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—"টিকিট-বাবু একটা সিকি অচল দিয়েছিল, তা'র জন্যে এত দেরী। তুমি আমতলী যাবে?"

—"হুঁ—"

—"কা'র বাড়ি?"

—"আমতলী থেকে দু'ক্রোশ দূরে সিংগীহাটি যা'ব—"

—"সিংগীহাটি ? কা'র বাড়ি ?"

—"চণ্ডী রায়ের বাড়ি—"

—"চণ্ডী রায়ের বাড়ি ? সেখানে কি জন্যে ?"

—"আমার দিদির বাড়ি।"

—"তুমি চণ্ডীবাবুর কুটুম ?" লোকটা হেসে বল্‌লে।

—"হুঁ—"

—"তা' ভাল। আমিও ঐ গাঁয়ে যা'ব। আমার বাড়িই ওখানে। এদিকে কিছু জমি আছে ; তাই মাঝে মাঝে আস্‌তে হয়। চণ্ডীবাবুর বাড়ির পর একখানা পুষ্করিণী আছে—"

—"দেখেছি—"

—"রায়মশায়েরই পুষ্করিণী ; ওর ওপারে আমার বাড়ি। এখন একটু শুয়ে থাক। আমতলী পৌঁছতে সেই বেলা দুটো—" ব'লে লোকটা আধময়লা কামিজের পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বা'র ক'রে তা' থেকে একটা পান নিয়ে গালে পূর্‌লে ; তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে টান্‌তে লাগ্‌ল। বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে লোকটা বার দুই গণেশের মুখের দিকে তাকালে। বিড়ির গন্ধে গণেশ নাক সিঁট্‌কাচ্ছে। লোকটা বল্‌লে—"তুমি বুঝি খাও না ?"

—"না—"

—"ভাল। আচ্ছা আমি ঐ দিকে যাই। একটু শোব—" ব'লে সে জানালার ধারে গিয়ে বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়্‌ল।

গাড়ি চলেছে। সময়টার কথা এতক্ষণ লেখা হয় নি, এবার লিখি।

ভাদ্র শেষ হ'য়ে এসেছে; অর্থাৎ তখন ভরা শরৎকাল। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু তাতে জল নেই; মাঠে মাঠে ধান আছে, কিন্তু অনেক মাঠ শস্যশূন্য; লাইনের দু'পাশের খালে জল আছে, কিন্তু তা' ঘোলা নয়। মাঝে মাঝে বক উড়ছে। পদ্ম, কাশ, কলমী বনের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। সাদা, নীল, লাল ও সবুজ রঙে চারধার উজ্জ্বল ও আলোকিত। গণেশ ব'সে ব'সে দেখছে।

গাড়ি অনেকদূর চ'লে এল। বেলা বারোটা হবে। লোকটা চীৎ হ'য়ে হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছে। এর মধ্যে আর কেউ কামরাটায় ওঠে নি। গণেশের পেট জ্বল্‌ছে। সে খাবারের পোঁট্‌লাটা খুলে বস্‌ল।

মা তা'কে বেশি খাবার দেন নি—দু'খানা চন্দ্রপুলী, আটটা লাড়ু, একখানা আমসত্ব, আর এক ডেলা ক্ষীর। খাবারগুলোর দিকে তাকিয়েই তা'র জিভে জল এল। ক্ষিদেটাও খুব বেড়ে গেছে। তা'র চন্দ্রপুলীগুলো তো সব গেছে ভেঙ্গে। দিদির গুলোও হয়ত আস্ত নেই। সে তা'র দিদির চন্দ্রপুলীগুলোও খুলে দেখ্‌লে, সত্যি দু'খানা একদম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে! কতকগুলো লাড়ু চ্যাপ্টা হ'য়ে গেছে। দিদি কি ভাব্‌বে? মনে কর্‌বে সে একটু একটু খেয়েছে। বল্‌লেও বিশ্বাস কর্‌বে না যে, রাস্তায় ঝাঁকি লেগে ভেঙ্গেছে। দিদি তা'কে এমনই তো বলে—"পেটুক গণেশ"। ভাঙ্গাগুলো আর দিদিকে দিয়ে কি হ'বে?

সে ভাঙ্গা চন্দ্রপুলী দু'খানা ও চ্যাপ্টা লাড়ু চার্‌টে বা'র ক'রে নিয়ে নিজের খাবারের সঙ্গে রেখে দিদির খাবারগুলো বেঁধে রাখ্‌লে।

তারপর একবার দেখ্‌লে, লোকটা কি কর্‌ছে। লোকটা যখনও হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছিল! গণেশ তা'র দিকে পিছন ফিরে ব'সে খেতে লাগ্‌ল। কিন্তু কেবল মিষ্টি! খেতে খেতে তা'র গলা শুকিয়ে এল। একটু জল যদি পাওয়া যেত। সে গলা বাড়িয়ে দেখ্‌লে সাম্‌নেই স্টেশন। এদিকে খাওয়াও শেষ হ'য়ে গেছে। স্টেশনে গাড়ি থাম্‌তেই সে পানি পাঁড়ের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে লাগল। লোকটাও ততক্ষণে উঠে বসেছে। গণেশের হাতে পানি পাঁড়ে জল ঢেলে দিচ্ছে দেখে সে বল্‌লে—"গেলাস দেবো? বাক্‌সের মধ্যে আছে—"

গণেশ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না—"

আবার গাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল। লোকটা আর ঘুমোল না, ব'সে ব'সে বিড়ি টান্‌তে লাগ্‌ল। গণেশও এবার গুন্ গুন্ ক'রে গান ধর্‌লে। লোকটা ছিল ব'লে লজ্জায় সে গলা ছেড়ে গাইতে পার্‌লে না।

গাড়িও থামে না, গণেশেরও গানের বিরাম নেই। সেই লোকটাও আপন মনে বিড়্-বিড়্ কর্‌ছে আর মাথা নাড়্‌ছে। শেষে বেলা দেড়টার সময় গাড়ি এসে আমতলী থাম্‌ল। গণেশ পোঁট্‌লা দুটো নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়্‌ল নেমে। লোকটা বল্‌লে—"তাড়া কিসের? গাড়ি এখানে পাঁচ মিনিট ধরে—"

তারপর দু'জনে গেটে টিকিট দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। লোকটা বল্‌লে—"সালতিতে যাবে তো?"

—"হুঁ—"

—"তবে চল! একখানাতেই দু'জনে যা'ব।"

গণেশ তা'র পিছনে পিছনে চল্‌ল। স্টেশন থেকে ঘাট বেশি দূর নয়; রাস্তায় দাঁড়ালে দেখা যায়। দু'জনে এসে নদীর ধারে দাঁড়াল।

ছোট নদী; খাল বল্‌লেই চলে। স্রোত অল্প। তারা ভাটিতে যাবে। ভাড়া ঠিক ক'রে দু'জনে একখানা সালতিতে উঠ্‌ল। তাদের দু'জনের পোঁট্‌লা তিনটে, আর টিনের বাক্সটা রইল একজায়গায়।

সাল্‌তি চলেছে। দু'পাশে উঁচু পাড়। পাড়ে কাশের বন, গ্রাম, মাঠ, বাগান পিছনের দিকে স'রে যাচ্ছে। প্রায় ক্রোশ দেড়েক গিয়ে লোকটা সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বল্‌লে—"ঐ সিংগীহাটির মন্দির দেখা যায়—"

গণেশ তাকিয়ে দেখ্‌লে, গাছপালার মধ্যে একটা সাদা চূড়া দেখা যাচ্ছে। তারপর তা'রা যখন ঘাটে পৌঁছল—বেলা আর নেই। রাখাল-কৃষাণ গরু তাড়িয়ে বাড়ি ফির্‌ছে। গণেশ তা'র পোঁট্‌লা দুটো হাতে তুলে নিলে। লোকটাও একটা পোঁট্‌লা ও টিনের বাক্স নিয়ে নেমে পড়্‌ল।

দু'জনেই চলেছে! কিছুদূর গিয়ে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। গণেশ গিয়ে দাঁড়াল তা'র দিদির বাড়ির বাইরের উঠোনে, সেই লোকটা চ'লে গেল পাশের বাঁশবনের দিকে।

গণেশকে দেখে তার ভগ্নীপতি ভারি খুশী। তিনি তখন বাইরে জলচৌকির ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি তামাক খেতে খুব ভালবাসেন; বল্‌লেন—"এস, এস। সব ভাল তো? ওরে শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত রে—"

শ্রীকান্ত চাকর তখন গোয়ালে খোঁটা পুঁত্‌ছিল। উত্তর দিলে—"কি বলেন?" বল্‌তে বল্‌তে খোঁটা হাতে বেরিয়ে এল।

—"ভেতরে খবর দে, কুটুম এসেছে। একে নিয়ে যা'—"

গণেশ তা'র ভগ্নীপতিকে প্রমাণ ক'রে পোঁট্‌লা হাতে শ্রীকান্তর পিছন পিছন চল্‌ল।

হঠাৎ গণেশকে দেখে দিদিও আনন্দ চাপ্‌তে পারে না; বল্‌লে—"আয়—আয়। মা কেমন আছে রে?"

গণেশ কোন দিন দিদির পায়ের ধূলো নেয় না; আজ কিন্তু নিয়ে বল্‌লে—"ভাল।" তারপর খাবারের পোঁট্‌লাটা তা'র হাতে দিতে দিতে বল্‌লে—"মা তোমার জন্যে খাবার পাঠিয়েছে—"

দিদি হাস্‌তে হাস্‌তে পোঁট্‌লাটা গণেশের হাত থেকে নিলে; তারপর বল্‌লে—"ও পোঁট্‌লায় কি আছে?"

—"আমার জামা-কাপড়।"

—"দে আমার হাতে—"

চাকর হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে। গণেশ হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বস্‌ল। দিদি মনে করলে, সে বুঝি সারাদিন কিছুই খায় নি; বল্‌লে—"তোর মুখ শুকিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। এখন এইগুলো খা, আমি শীগ্‌গিরই রান্না ক'রে দিচ্ছি।" ব'লে তা'কে বাটিতে করে ক্ষীর, সালিধানের চিঁড়ে, মর্তমান কলা আর গুড় এনে দিলে। গণেশ পেট পুরে খেয়ে আঁচিয়ে এল।

এমন সময় তা'র ভগ্নীপতি এলেন ভেতরে। গণেশের দিদি

খাবারের পোঁট্‌লাটা তাঁর সাম্‌নে বা'র ক'রে খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"মা, এই খাবারগুলো পাঠিয়েছেন—"

গণেশও সেখানে ছিল। পোঁট্‌লাটার বাঁধন খুলে পাতাখানা সরিয়েই দিদি বল্‌লে—"এ কি খাবার রে গণ্‌শা ?"

তা' দেখে গণেশও অবাক্! বল্‌লে—"এ্যাঁ! সেই চন্দ্রপুলী, লাড়ু, আমসত্ব সে-সব তবে গেল কোথায় ?"

ভগ্নীপতি হেসে বল্‌লেন—"গণেশবাবু ঠাট্টা কর্‌ছ। আমি তামাক খেতে ভালবাসি ব'লে সের চারেক তামাক এনে বল্‌ছ—চন্দ্রপুলী, লাড়ু, আর আমসত্ব—!"

—"সত্যি বল্‌ছি, রায় মশায় ; না—"

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—"রায় মশায় আছেন ?"

সেই ডাক শুনে রায়মশায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

দিদি বল্‌লে—"কি লজ্জা বল্ দেখি ? তুই শেষে তামাক আন্‌লি ?"

—"না দিদি, বিশ্বাস কর—"

আবার রায় মশায়ের খড়মের আওয়াজ শোনা গেল। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে আসছেন। তাঁর হাতে পোঁট্‌লা।

তিনি এসেই বল্‌লেন—"হয়েছে। খাবারের পোঁট্‌লাটা গিয়েছিল জিতে দত্তর সঙ্গে, আর তা'র তামাকটা এনেছিলেন আমাদের গণেশবাবু—" ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। গণেশের দিদিও হেসে সারা। গণেশ খুঁটির গায়ে মুখ লুকিয়ে হাস্‌ছে।

গণেশের ভগ্নীপতি বল্‌লেন—"যাই হোক্, ওর কিছু অন্ততঃ জিতেকে দিতে হবে ; সন্ধ্যেবেলা পাঠিয়ে দিও।"

সন্ধ্যাবেলা গণেশের দিদি জিতে দত্তর বাড়ি একখানা চন্দ্রপুলী, গোটা আষ্টেক লাড্ডু, সিকিখানা আমসত্ব পাঠিয়ে দিলে। জিতেও শুধু হাতে দান নিলে না,—চণ্ডী রায়কে পাঠিয়ে দিলে আধ সেরটাক তামাক।

সে-রাতে জিতে চন্দ্রপুলী খেয়ে, আর চণ্ডী রায় তামাক টেনে গণেশকে খুব বাহবা দিলে—তা'র জন্যই তো এমন লাভ! কিন্তু গণেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—'বাড়ি গিয়ে মাণ্টু বাঁদরের মাথা ভাঙ্গব। তা'র জন্যই ত এত কাণ্ড!'

তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। ডোবার ধারে বাঁশবনের মাথায় সূর্য নামে-নামে। লালু উঠোনের এক কোণে ছেঁচ-তলার ছায়ায় ব'সে বেলের আঠা দিয়ে খবরের কাগজের ঘুড়ির প্রকাণ্ড লেজ তৈরি করছিল। লেজ না হ'লে ঘুড়ি উড়তেই চায় না; কেবল নেমে পড়ে।

তার খুড়োমশায় ডাকলেন—"নেলো!"

লালু তাড়াতাড়ি আঙ্গুলের আঠা কাগজে মুছতে মুছতে উত্তর দিলে —"যাই।" তারপরে ছুটে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

খুড়োমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করছ?"

লালু নখ খুঁটতে খুঁটতে চুপ ক'রে রইল। খুড়ীমা ঘরের কোণে মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছিলেন। লালুর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন; বললেন—"কি আবার করবে? যা করে।"

খুড়োমশায় চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার ঘুড়ি? সেদিন যে তোমাকে বারণ ক'রে দিয়েছি, আর ঘুড়ি উড়িও না। মনে নেই, তারাচাঁদ ডাক্তারের ছোট ছেলে পচার সঙ্গে মারামারির কথা?"

লালু ঘাড় নেড়ে জানালে—"হাঁ।"

—"তবে যে আবার ঘুড়ি ওড়াচ্ছ?"

— ঘুড়ি ওড়াই নি; তৈরী করছিলাম—"

তার উত্তর শুনে খুড়ীমা হেসে ফেললেন; খুড়োমশায় আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। চাদরখানা গলায় তুলতে তুলতে বললেন—"আজ

তোমাকে হাটে যেতে হবে ; আমি পারব না। আমার এখনই কাছারি যাওয়ার দরকার। কি আনতে হবে তোমার কাকীমার কাছ থেকে শুনে, টাকা নিয়ে রওনা হও—"ব'লে তিনি ঘরের কোণ থেকে হারিকেন-লণ্ঠন ও ছাতা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে নিচে নামলেন। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন—"দেরী ক'রো না ; এই বেলা যাও। না হ'লে ফিরতে রাত হবে—"ব'লেই ধানের গোলার পাশ দিয়ে উত্তর-দিকে চ'লে গেলেন।

দূর থেকে একবার তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বোধ হয় বেগুন ও লঙ্কা ক্ষেতে গরু ঢুকেছিল ; তাড়িয়ে দিলেন। লালুর মনে পড়ল, বাগানের হুড়কোটা কাল সে ভেঙ্গে ফেলেছে। চাকর নিতাই এখনও একটা নতুন হুড়কো তৈরি করে নি। ভাগ্যে খুড়োমশায় জানেন না, কার কাজ। নিতাইকে সে একটা পয়সা দেবে ব'লে, ব্যাপারটা চেপে রেখেছে।

খুড়ীমা বললেন—"নে রে ছোঁড়া! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যেতে হবে না?" ব'লে তিনি কাঁথা ফেলে উঠলেন। ঘর থেকে আসতে আসতে বললেন—"আজ তোর মাসী আসবে জানিস্ না?"

—"মাসীমা আসবে! কখন?"

—"সন্ধ্যে বেলা। তা'রা আজ সকালে রওনা হয়েছে। নৌকোয় আসতে সারাদিনই তো কেটে যায়। যা, জামা গায়ে দিয়ে আয়—"

মাসীমা লালুকে সেবার যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। লালু বললে—"ওঃ কেয়া মজা!"

সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে বাঁশের আলনা থেকে তার জামাটা পেড়ে গায়ে দিলে। কোমর আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

খুড়ীমা রান্নাঘর থেকে খালুইটা এনে উঠানে রেখে আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বা'র ক'রে বললেন—"এই নে—বেশ ভাল দেখে একটা মাছ আনবি। আর ঐ সঙ্গে দু'পণ পান, আধসের সুপুরী, চার পয়সার খয়ের। আর যদি পাস্ ত সের খানেক আলু কিনিস্—"

—"এতসব আনব কিসে?"

—"কেন, অত বড় খালুইটাতে ধরবে না? তবে ঐ ছোট খালুইটাও নে।"

লালু খুড়ীমার হাত থেকে টাকাটা নিলে। খুড়ীমা বললেন—"টাকাটা কাপড়ের খুঁটে বেশ ক'রে বেঁধে পেটের সঙ্গে গুঁজে রাখ।"

"ভয় নেই, হারাবে না।" ব'লে খালুই দুটো হাতে তুলতেই লালুর মনে পড়ল, তার ঘুড়ি, লাটাই, ঘুড়ির লেজ, কাগজ, আধখানা কাঁচা বেল, হেঁসোখানা ছেঁচতলায় প'ড়ে আছে। হেঁসো দিয়ে সে কাগজ কাটছিল। সে খালুই দুটো মাটিতে নামিয়ে তার জিনিসগুলো ঢেঁকী-ঘরের কোণে রেখে এল। তারপর ছুটে এসে খালুই দুটো হাতে তুলে তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

গাঁ থেকে ফকিরগঞ্জের হাট দেড় ক্রোশ, মাঝে একটা নদী। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে—বৃহস্পতি ও রবিবারে। সেদিন রবিবার। আধ-ক্রোশের মাথায় খেয়াঘাট। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার ধ'রে ক্রোশটাক গেলেই হাট। দূর থেকে হাটের ধারে বড় বটগাছটা দেখা যায়। নদী পার হ'তে হ'তে হাটের ঘাটের নৌকোগুলোও চোখে পড়ে। হাটের

ওধারেও একটা খেয়া আছে। সেটা দিয়ে হাট কাছে হয়; কিন্তু এপারে হাঁটতে হয় ঠিক ওপারের সমান।

লালু চলেছে। জোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জনকয়েক জোলা তার সঙ্গী হ'ল।

তা'রাও যাচ্ছে হাটে। কেউ নিয়েছে এক মোট নতুন গামছা, কেউ নিয়েছে সুতো, কেউ নিয়েছে চাদর।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো নালুবাবু! হাটে যাবে নাকি?"

—"হুঁ—"

—"তা একা যে! নিতাই কৈ?"

—"জানিনে—"

জোলাটা নিজেদের মধ্যে একজনকে বললে—"বুঝলে গো চাচা, মাধববাবু মরার পর ছেলেটারও হাল হয়েছে।"

—"ছাড়ান দেরে ভাই। ভদ্দর নোকের কথা—"

জোলাপাড়ার পর প্রকাণ্ড ধান-ক্ষেত। আলে আলে যেতে হয়। ক্ষেত পার হ'লেই খেয়াঘাট; ঘাটের উপর পাটনীর ঘর। তার সামনে একখানা নৌকোর ভাঙ্গা ছই, কতকগুলো ছোট ছোট ঝাঁপ ও একটা গলুই প'ড়ে আছে।

লালু ক্ষেত পার হয়ে সেখানে গিয়ে দেখলে খেয়া ওপার থেকে রওনা হয়েছে। জনকয়েক হাটুরে বেসাতি নামিয়ে ব'সে গল্প করছিল। লালু তাদের কাছে না ব'সে ভাঙ্গা ছইটার উপর গিয়ে বসল। খেয়া ভিড়তে এখনও কিছু দেরী।

তারপর খেয়া-নৌকো ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে সে পাড় দিয়ে নিচে নেমে সকলের আগে গিয়ে উঠল খেয়ায়। হাটের বেলা ; দেরী করা চলে না। যাত্রী নিয়ে তখনই খেয়া ছাড়ল।

খেয়া চলেছে। এদিক-ওদিক দিয়ে ডিঙ্গি ও ব্যাপারীদের দু-একখানা বজরা বা পানসী যাওয়া-আসা করছে।

লালু বসেছিল ধারে পা ঝুলিয়ে। পাটনী বললে—"স'রে বস। হাতে দড়ি দেবে নাকি ? ঐ টানে একবার পড়লে নিয়ে যাবে সেই মহেশপুরের ঘাটে।" কিন্তু লালু পাটনীর কথায় কান দিলে না। পায়ের নিচ দিয়ে নদীর স্রোত যাচ্ছে, দেখে তার বড় আনন্দ।

পাটনীর ভাই সকলের কাছে পারাণির পয়সা আদায় করছে। কেউ বলছে—"কাল দেব", কেউ বলছে—"ফিরতি বেলা", কেউ ট্যাঁক থেকে পয়সা বা'র করছে। লালুর কাছে এসে সে পয়সা চাইতেই পাটনী বললে—"বোসমশায়ের ভাইয়ের বেটা।" পাটনীর ভাই লালুর কাছে আর পয়সা চাইলে না।

লালু তার পাশের লোকটির সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে। নদী কোথা থেকে আসে, পাহাড় কি রকম, স্টিমার কেমন দেখতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার অনর্গল বক্তৃতায় পিছন থেকে একটা লোক ব'লে উঠল—"তুমি উকিল হবে বাবু।"

শুনে লালুর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তার বক্তৃতা আর থামে না, লোকগুলোও তার কথায় আর কান দিলে না।

খেয়া পারে পৌঁছল, কিন্তু টানে ঘাটে ভিড়তে পারলে না ; ভাটিতে কিছু দূর চ'লে গেল। জায়গাটায় উঁচু পাড়। তার গায়ে গাঙশালিখের

বাসা। যাত্রীদেরই একজন দাঁড়ে বসেছিল। নৌকো উজিয়ে গিয়ে ঘাটে লাগল। তখনও লগি পোঁতা হয় নি। লালু লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামতেই নৌকোর উপর থেকে কে যেন বললে—"ওরকম ক'রে নেম না হে। হাত-পা ভাঙ্গবে।"

লালু ফিরে দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত শশধরবাবু। সে জিভ কেটে পাড় দিয়ে তাড়াতাড়ি তীরে উঠে হাটের পথ ধ'রে চলল।

সামনে একপাল গরু ও ছাগল হাটের দিকে চলেছে। তাদের ক্ষুরে ক্ষুরে ধূলো উড়ছে। লালু পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙ্গে ছুটতে ছুটতে তাদের ছাড়িয়ে গেল।

ঐ যে ফকিরগঞ্জের হাটের বড় বটগাছটা দেখা যায়। পথ দিয়ে নানা রকমের লোক যাওয়া-আসা করছে। কেউ বেসাতি নিয়ে যাচ্ছে; কেউ সওদা নিয়ে ফিরছে; কেউ সওদা করতে চলেছে।

হাটটা লালুর চেনা, সে অনেক বার হাটে এসেছে। হাটের মুখেই সার্কাস হচ্ছিল; এক পয়সার খেলা। সার্কাসের ছোট তাঁবু। কয়েকটি মুসলমান তার বাইরে দাঁড়িয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে চীৎকার ক'রে বলছে—"ভানুমতীর খেল্ এক পয়সা—চ'লে এস।"

তাদের একজন একটা টুপির ভিতর থেকে মুঠো মুঠো কাগজের সরু ফালি বা'র ক'রে চিবচ্ছে; আর বলছে—"নাস্তা, নাস্তা!" ব'লেই মুখের ভিতর থেকে একটা কাগজের ভেঁপু টেনে বা'র করছে।

লালুর ইচ্ছে করতে লাগল, সে এক পয়সা দিয়ে ভিতরে যায়। একটা টাকা ত আছে। সে ট্যাঁকে হাত দিয়ে টাকাটা বা'র করতে গিয়েই চম্‌কে উঠল। টাকা কোথায় গেল? এ ট্যাঁকে আছে কি?

না, এ ট্যাঁকেও ত নেই। পকেটে রেখেছে কি? সে তিনটে পকেটই হাঁতড়ে দেখলে। না, নেই ত! তার বেশ মনে হচ্ছে, খুড়ীমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে গুঁজলো ট্যাঁকে। ট্যাঁকেই রেখেছিল; ট্যাঁক ছাড়া সে কোথাও রাখে নি। সে আবার ট্যাঁক দুটো ও সেই সঙ্গে জামার পকেট তিনটে খুঁজলে।

ভয়ে তার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ। কি দিয়ে সে হাট করবে? খুড়োমশায় শুনলে রক্ষা থাকবে না; বলবেন, "একটা টাকা রোজগার করতে ক' ফোঁটা রক্ত জল হয় জান?" টাকাটা সে কোথায় পাবে? পথে পড়েছে কি? পড়লেও ত পাওয়া যাবে না। তার চোখে জল এল। সে খালুইশুদ্ধ হাত দুখানা পিছনে দিয়ে টাকাটা পথের চারধারে খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে চলল।

পথে কেবল ধুলো; গোবর ও শুকনো ঝাঁটিনটের গাছ। সাদা জিনিস চোখে পড়লেই তার বুক নেচে উঠে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে, সেটা শামুকের ভাঙা খোলা। তার বুকটা আবার দমে যায়। একটা টাকা সে কোথায় পাবে? কি ক'রে টাকাটা হারাল? নিশ্চয়ই পথে কোথাও প'ড়ে গেছে। খুড়োমশায় বলবেন, "তুমি অসাবধানী।" তারপরই বেত পড়বে। তার জন্যে একখানা বেত তোলা আছে। আবার তার চোখে জল এল। কি করবে সে? সে ত ইচ্ছে ক'রে হারায় নি। চট্ ক'রে তার মনে পড়ল, মাসীমা ত এবারও যাবার সময় তাকে একটা টাকা দিয়ে যাবেন। এখন যদি একটা টাকা ধার পায় ত সেই টাকা দিয়ে ধার শোধ দেবে।

সে ঘাড় তুলতেই দেখে তার সামনে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি খুঁজছ? হাটে যাও নি?"

লালু ঢোক গিলে বললে—"না স্যার, আমার টাকাটা—"

—"হারিয়েছে? হারাবারই কথা। তোমার মত চঞ্চলমতি বালকেরাই অসাবধানী হয়। সম্ভবতঃ খেয়াঘাটেই তোমার টাকাটি হারিয়ে থাকবে। কোথায় রেখেছিলে?"

—"ট্যাঁকে—"

—"না পকেটে? পকেটে টাকা রাখলেই হারায়। সেই যখন লাফিয়েছিলে তখনই প'ড়ে গেছে। দেখ, তোমার দোষেই এরকম ক্ষতি হ'ল। বাড়িতে কতখানি অসুবিধার কারণ হবে বুঝতে পারছ?"

লালুর চোখ দুটো ছল্-ছল্ ক'রে উঠল; বললে—"স্যার, আমাকে একটা টাকা ধার দেন; কাল ইস্কুলে শোধ দেব।"

পণ্ডিতমশায় প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন; তারপর বললেন—"দেখ, আমি দিতে পারি। তবে কিনা টাকাটা আমার নয়। তোমারই খুড়োমশায়ের টাকা। আমি কাল কলকাতা যাব। তিনি একটি ওষুধ কিনতে আমাকে কয়েকটি টাকা দিয়েছেন। আমি তাই থেকে তোমায় দিচ্ছি"—বলতে বলতে তিনি পেটের উপরের কোঁচাটা খুললেন। লালু দেখলে, তার খুঁটে জড়িয়ে বাঁধা একখানি ময়লা রুমাল। রুমালের খুঁটে বাঁধা একখানি পাঁচ টাকার নোট, কয়েকটি টাকা ও রেজ্‌কি। তিনি তাই থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে বললেন—"দেখো বাবা, আমাকে অপদস্থ ক'রো না।"

টাকাটা নিতে লালুর বুক কেঁপে উঠল। তার খুড়োমশায়ের টাকা! কিন্তু সে ত দিয়ে দেবে। মাসীমার কাছ থেকে আজ রাতের বেলায়ই সে চাইবে। মাসীমা তাকে ভালবাসেন, সেবার সঙ্গেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে টাকাটা হাতে নিয়ে বললে—"স্যার, টাকাটা আমি কাল ঠিক দেব। কিন্তু আপানার পায়ে পড়ি, খুড়োমশায়কে বলবেন না।"

—"সে কথা বিবেচনা করা যাবে। আজ যে শিক্ষা লাভ করলে, কখনও ভুলো না! সর্বদা ধীর ও সাবধানী হবে।"

"হ্যাঁ স্যার" বলে'ই লালু হাটের দিকে ছুটল। কিন্তু সে মনে আর স্ফূর্তি পেল না।

মস্ত হাট। কোথাও কাপড়-গামছা-সুতো, কোথাও মাছ, কোথাও মুড়ি-চিড়ে-গুড়-বাতাসা-জিলাপী, কোথাও মাদুর-চাটাই, টিন, চিটেগুড় বিক্রী হচ্ছে। তরি-তরকারিও এসেছে নানা রকমের। হাটের ধারে ধারে দোকান-পসার—পান, মসলা-পাতি, টিনের ছোট আয়না, ঘুনসী, কাঁকই এমনিতর নানা জিনিসের। ওদিকে গোহাটা; তার এধারে কতকগুলো গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে। কোথাও মুরগী ও ছাগলের হাট বসেছে। কোথাও ভিখারীর দল নানান সুরে চীৎকার করছে। কোথাও বা ব্যাপারীতে ব্যাপারীতে এক গাদা খালি বস্তা সামনে রেখে তুমুল বচসা। চারধারে ঠেলাঠেলি, চীৎকার, গোলমাল। লালু খালুই দুটো হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তাল খালুই ভর্তি সওদা। মাছটা বেশ বড়; ওজনে সের দুই হবে। খুড়ীমা যা যা বলেছিলেন, সবই সে কিনেছে। কিনেও বেঁচেছে সাড়ে তেরো পয়সা।

সে একবার ভাবলে, পয়সাগুলো পণ্ডিতমশায়কে ফেরৎ দেয়। তার পরই মনে পড়ল, খুড়ীমার কাছে হিসাব দেবার সময়ে ধরা পড়বে। সে টাকা হারানোর কথা কাউকে বলবে না, এক মাসীমা ছাড়া।

হাটের বাইরে এসে পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে খালুই দুটো দু'হাতে তুলে সে ফিরে চলল।

বেলা প'ড়ে এসেছে ; নদীর জলে কালো ছায়া। মাথার উপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে ; পাড়ের গায়ে গাঙশালিখেরা কিচির-মিচির করছে। অনেকেই হাট থেকে ফিরছিল। সামনে একখানা খালি গরুর গাড়ি ধূলো উড়িয়ে যাচ্ছিল। খালুই দুটো ভারী ; লালু একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গাড়িখানার পিছনে পৌঁছে খালুই দুটো তার উপর রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলল। গাড়োয়ানের খেয়াল নেই ; সে তার পিছনে যে লোকটা বসেছিল, তার সঙ্গে গল্পে মশগুল। গত বছর কোন কোন গাঁয়ে সে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, কত টাকা রোজগার করেছিল, তাই নিয়ে আলোচনা করছে।

চলতে চলতে খেয়াঘাট দেখা দিল। দু'চারজন নৌকোয় উঠে বসেছে ; কেউ কেউ উঠছে। এবার লালুর ভয় হ'ল। যদি মাসীমা না আসে ? সে যত ঠাকুর-দেবতার নাম জানত সকলকে মনে মনে ডাকতে লাগল। খেয়া ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় সে গিয়ে খেয়ায় উঠল। এবার সে চুপচাপ ব'সে আছে। খেয়াটাতেও যাত্রী ও বস্তা, হাঁড়ি, মাছ, পান প্রভৃতি জিনিস-পত্রে ঠাসাঠাসি। একজন দুটো পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। পাঁঠা দুটো মাঝে মাঝে "ম্যা-ম্যা" করছে।

খেয়া যত কূলের কাছে আসে লালুর ততই ভয় করে। কিন্তু ঐ যে একখানা ডিঙি খেয়াঘাটের এধারে কূলে বাঁধা। মাঝিরা রান্নার যোগাড় করছে। একজন মশলা বাঁটছে। ঐ ডিঙিতেই বোধ হয়...একবার সে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে?

খেয়া আবার অঘাটায় গিয়ে পড়ল। দাঁড় টেনে ডিঙির পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাটনী জিজ্ঞাসা করলে—"কোথাকার ডিঙি গো?"

মাঝি উত্তর দিলে—"কালীডাঙার।"

—"যাবে কোথা?"

—"মহেশপুর।"

—"ওঃ?"

—"মহেশপুর।"

—"এখানে যে?"

—"সওয়ারী ছিল।"

লালুর মন আনন্দে নাচছে—মাসীমা এসেছে! পণ্ডিত-মশায়ের টাকা সে কাল ইস্কুলে গিয়েই দিয়ে দেবে।

তখন সন্ধ্যা লাগে-লাগে। খুড়োমশায় ফিরেন নি। তিনি ফিরবেন রাত্রে।

লালু বাড়ির ভিতরে ঢুকেই দেখে সামনে খুড়ীমা। তিনি তাকে দেখে ব'লে উঠলেন—"কিরে! বাড়ি এলি যে?"

লালুর বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। সে খালুই দুটো মাটিতে নামাল।

খুড়ীমা বললেন—"এসব কিনলি কি দিয়ে?"

লালু অবাক হয়ে গেল। তার টাকা হারানোর কথা তিনি জানলেন কি ক'রে? পণ্ডিতমশায় ত ফেরেন নি। সে আসবার সময় তাঁকে শ্রীনিবাস সা'র দোকানে ব'সে তামাক খেতে দেখেছে; বললে—"টাকা দিয়ে।"

—"টাকা পেলি কোথায়?"

—"তুমি দিয়েছিলে—"

—"আমি ত দিয়েছিলাম। তুই নিয়েছিলি?"

—"হাঁ।"

—"ফের মিছে কথা?"

গোলমাল শুনে মাসীমা সেখানে এলেন। তাঁর কোলে একটি মোটা-সোটা খোকা। মাসীমা জিজ্ঞাসা করেলেন—"কি হয়েছে?"

লালু মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তাঁকে যেন একটু অচেনা ঠেকছে। তিনি যেন ঠিক সেই মাসীমা ন'ন। মাসীমা এর আগে যখন এসেছিলেন তখন খোকা হয় নি।

খুড়ীমা বললেন—"আমি ওঁকে বাজারের টাকা দিয়েছি। উনি টাকাটি ঐ ছেঁচতলায় রেখে ঘুড়ি-লাটাই ঘরে তুলে খালুই নিয়ে হাটে গেছেন।....টাকা পেলি কোথায় বল্?"

—"সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে ধার করেছি।"

মাসীমা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন—"ও বাবা! সেই নেলো এমন হয়েছে?"

খুড়ীমা বললেন—"দেখলে ত? দাঁড়াও। আসুন আজ।" বলতে বলতে তিনি খালুই দুটো হাতে তুলে নিলেন।

লালু চট্ ক'রে তার খুড়ীমার পায়ের উপর প'ড়ে বললে—"তোমার পায়ে পড়ি কাকীমা, তুমি কাকাকে ব'লো না! আমি এবার থেকে খুব সাবধানী হব।"

—"আচ্ছা, ছাড়, পা ছাড়্। মনে থাকে যেন!"

লালু ঘাড় নেড়ে বললে—"থাকবে।"

মাসীমা বললেন—"ছোঁড়া এতও জানে।"

খুড়ীমা একথার কোন জবাব দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত ফিরেছে?"

—"সাড়ে তেরো পয়সা।"

—"কাল ইস্কুলে গিয়ে টাকাটা পণ্ডিতমশায়কে ফেরৎ দিবি। বাকী পয়সাগুলো তোর মাসীর হাতে দে।"

লালুর বুকের ভার সব নেমে গেল! তার মনে পড়ল, মাসীমাকে প্রণাম করা হয় নি। সে টপ্ ক'রে তার মাসীমার পায়ে প্রণাম করতেই মাসীমা বললেন—"হয়েছে-হয়েছে। তোর সুবুদ্ধি হোক।"

মাসীমার আশীর্বাদ খচ্ ক'রে লালুর বুকে বিঁধল। কেউ তাকে ভালবাসে না!

যাহোক, সন্ধ্যা ও পরের সকালটা মাসীমার খোকাকে নিয়ে তার বেশ আনন্দেই কাটল। খুড়ীমা খুড়োমশায়ের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন না।

মাসীমা সেইদিন বিকেলেই চ'লে যাবেন। ইস্কুলে যাবার সময় লালু বার বার ক'রে বললে—"মাসীমা, আমি না ফিরলে যেও না।"

মাসীমা এই অনুরোধের উত্তরে শুধু একটু হাসলেন। খুড়ীমা তাকে টাকাটা চুপি চুপি দিয়ে বললেন—"নিয়ে যা।"

লালু লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে চ'লে গেল। আজ বিকেলে সে মাসীমার কাছে একটা টাকা পাবে!

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে দেখে নিতাই মাসীমাদের বিছানা ও ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। মাসীমা ও মেসোমশাই বা'র-উঠানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খুড়োমশায় ও খুড়ীমা।

মাসীমা লালুকে বললেন—"তুই আর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে কি করবি?" বলতে বলতে আঁচলের গেরো খুলতে লাগলেন।

লালু আনন্দে মাসীমা ও মেসেমেশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাসীমা বললেন—"এই নে।"

লালু দেখলে, দুটো পয়সা! সে ছুটে ভিতরে চলে গেল। মাসীমা চীৎকার ক'রে বললেন—"নিয়ে যারে, নিয়ে যা—লজ্জা হয়েছে!.... আচ্ছা, দিদি, তুমিই ওর পয়সা দুটো রাখ।"

লালুর দু'চোখে জল। সে ঘরে গিয়ে বইগুলো কেরোসিন কাঠের সেল্‌ফের উপর রেখে, ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঘুড়িখানা পেড়ে নিয়ে তার লেজটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল!

তারপর একবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলে—শেষ-বেলার রৌদ্র-মাখানো ধান-ক্ষেতের আল দিয়ে ঐ মাসীমারা চলেছেন নদীর দিকে। সে আবার নীরবে কাঁদতে লাগল।

কাঁটাখালি ও কোদালচাঁচি

এখনও আশ্বিনে ঝড় উঠলেই আমাদের গাঁয়ের হরিপদকে মনে পড়ে।

তাকে চিন্‌তো না কে? সে পড়তো আমাদেরই সঙ্গে।

বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথায় লম্বা চুল, মুখের ওপর পাটির সামনের দাঁত দুটো ভাঙা। ছোটবেলায় ক্রিকেট বল লেগে দাঁত দুটো ভেঙে গিয়েছিল। ওঃ! সে কি রক্ত! কিন্তু হরিপদ একটু কাঁদে নি এবং তারপর ক্রিকেট খেলাও ছাড়ে নি। বরং আর সব খেলার চেয়ে ঐ খেলাতেই তার আকর্ষণ ছিল বেশি।

তার গায়ে ক্ষমতাও ছিল বেশ। সে সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে তার বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে খুব ভালোবাসতো। তার একটা প্রিয় খেলা ছিল, লোককে ভয় দেখানো।

"মারবো" "কাটবো" বলে নয়;—তাকে কারো গায়ে কখন হাত তুলতে দেখি নি, গালাগালও সে কাউকে দিত না। কিন্তু ভয় দেখাতো যত সব উদ্ভট গল্প বলে আর অন্ধকার রাত্রে কিছু সেজে চলে-ফিরে বেড়িয়ে বা গাছে উঠে গাছের ডালে দোলা দিয়ে কিংবা কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে।

অনেক বয়স্ক লোকও অন্ধকার বা জ্যোৎস্না রাতে তাকে কিম্ভূত-কিমাকার সাজে বেপট জায়গায় আচমকা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখে অথবা অট্টহাস্য করতে শুনে আঁৎকে উঠতেন।

পরদিন তাই নিয়ে বেশ আলোচনা—এমন কি কখন কখন তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হোত।

কিন্তু যাঁর প্রতি অন্যায় করতো তাঁকে সে এমন একটি ভেট দিত বা তাঁর এমন একটি উপকার করতো যে শেষে তিনিই হাসতে হাসতে বলতেন, "না, ছেলেটা এদিকে ভাল। আমরাও তো ও বয়সে কত দুষ্টুমি করেছি। ছেলেবেলায় দুষ্টু হওয়া ভাল। বড় হলে শান্ত হয়।"

তাঁকে তৎক্ষণাৎ সমর্থন করবার লোকের অভাব হোত না। কারণ হরিপদর দুষ্টুমীর ফল আরও কেউ কেউ ভোগ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "তা যা বলেছেন! ছেলেবেলায় যারা চুপচাপ্ থাকে তারা মিটমিটে, ভেতরে ভেতরে শয়তান। বড় হয়ে তারা হয়ে ওঠে ভীষণ লোক।"

মনে পড়ে হরিপদকে নিয়ে বয়স্কদের একটি দিনের আলোচনা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সেদিন আবার একজন বললেন, "ও কথা বলবেন না। ছেলেবেলায় আমাদের মধ্যে দুষ্টু ছেলে ছিল কমই। তাই বলে কি শয়তান লোকে গাঁ ভরে গেছে? তবে হাঁ"—বলেই তিনি বামুনপাড়ার কৃষ্ণরামবাবুর দিকে তাকান।

কৃষ্ণরাম তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, "থামলেন কেন? প্রমাণটা কি করতে চান বলেই ফেলুন—"

তারপর যা হয়, তা আমাদের শুনতে, দেখতে বা জানতে দেওয়া হয় নি। আমরাও জানতে চাই নি। কারণ বড়দের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভাল। আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলি! ওঁরা ভোলেন না।

যাক সে কথা।

একদিন গাঁয়ে এল একটি নতুন ছেলে। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাগ্নে সে। সেও গাঁয়ের ছেলে। আমাদের গাঁ থেকে একখানা গাঁ পরে তাদের বাড়ি। তফাৎ মাত্র তিনক্রোশ—মাঝে একটা বিল আর খানকয়েক ক্ষেত।

ছেলেটির বাবা ছিলেন ডাক্তার। বেশ পসার ছিল তাঁর। আমাদের গাঁয়েও মাঝে মাঝে আসতেন। ভদ্রলোক হঠাৎ মারা যান। তাই হেডমাস্টার মশাই ছেলেটিকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে রেখে লেখা-পড়া করাতে।

কারণ বাড়িতে সে পড়াশুনা কিছুই করতো না, মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। পাখির বাসা ভাঙ্গতো, ডিম ও ছানা চুরি করতো; পরের বাগানে ফলফুল রাখতো না। মালিক কিছু বললে গাছের গায়ে গর্ত করে তাতে হিং পুরে দিত। এক রাত্রের মধ্যেই কলার ঝাড় কেটে, মানগাছ উপড়ে এমন অবস্থা করে রাখতো যে যার ক্ষেত সে সকালে উঠে সেই দৃশ্য দেখে হাহাকার করতো। অথচ ডাক্তারবাবুর ছেলেটিই যে, সে সব করেছে তার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেত না!

এমনি কত রকমের কুকাজ যে সে করে বেড়াতো—কতখানি কুবুদ্ধি যে তার মাথায় ঘুরতো তা বলে শেষ করা যায় না।

কুবুদ্ধি সত্যিই খারাপ। ওতে লোকের খুব ক্ষতি হয়! তাই বলে সামরিক বিভাগে ওটা উপেক্ষণীয় নয়। যত রকমে সম্ভব কুবুদ্ধি খাটিয়ে শত্রুর ক্ষতি করতে পারাটাই সেখানে মস্ত গুণ। এই গুণ যার নেই তার আদরও নেই সেখানে। সে উন্নতিও করতে পারে না।

তা হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাগ্নে সমীর এল। তার গায়ের রঙ পোড়া লোহার মতো, নাকটি যেন খাঁড়া, চোখ ছুটি টানা, মাথার চুলগুলি ঘন ও কোঁকড়ানো, শরীরটিকে নধর বলতেই হবে। মুখে তার কথা নেই। দেখলেই মনে হল, গোবেচারা; তার বিরুদ্ধে যা কিছু শোনা গেছে সবই শত্রুপক্ষের কুৎসা।

কিন্তু আমাদের হরিপদ প্রথম দিন থেকে লাগলো তার পিছনে। বলতে ভুলে গেছি আমাদের গাঁয়ের নাম কাঁটাখালি আর সমীরদের গাঁয়ের নাম কোদালচাঁচি।

হরিপদর সমীরের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিলে। যেন সে সমীরের পরমহিতৈষী এমনি ভাব দেখাতে লাগলো।

সে সমীরকে জানিয়ে দিলে আমাদের গাঁয়ের কোন্ কোন্ জায়গা ভয়ের। কে কোথায় ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে, কে কোথায় ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সে সব কাহিনী সবিস্তারে বলে গেল। সমীর তার বড় বড় চোখ ছুটো আরও বড় করে, ওপরের ঠোঁট কামড়ে হরিপদর কথা শুনে গেল।

হরিপদ তার ভাব দেখে মুচকি হেসে বললে, "তুমি রাত-বিরেতে একা বেরিও না। আমাদের স্কুল থেকে আসতে ঐ যে পুরোনো পুকুর আর ভাঙা দরগাটা পড়ে, দেখেছো তো; ঐ জায়গা ছুটো হ'ল সব চেয়ে খারাপ। ওখানে—"

সমীর ভালমানুষের মতো বললে, "ওখানে জঙ্গলে বুঝি বড় বড় সাপ আছে?"

"আরে সাপ থাকলে তো ভালই হোত! সাপ কোথায় নেই বলতে পার? সেদিন আমাদের এই ক্লাসেই দপ্তরী ভোরে চারহাত লম্বা একটা কালকেউটে মেরেছিল। সাপ নয়—সাপ নয়, অপদেবতা। আমাদের গাঁয়ের সব ভাল হোত, যদি রাতের বেলা ওটা গাঁময় না ঘুরে বেড়াতো। লোকে বলে, এখানে রাতের বেলা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বলে, এর নাম হয়েছে কাঁটাখালি।"

সমীর বললে, "তুমি নিজে কখন দেখেছো?"

"দেখিনি। তবে শুনেছি।"

"যদি দেখতে তাহলে কি করতে?"

"কি আর করতাম? সবাই যা করে আমিও তাই করতাম। চেঁচিয়ে উঠেই অজ্ঞান। আচ্ছা! তুমি যদি কখন দেখ?"

সমীর আস্তে আস্তে বললে, "আমার বড় ভয় করে। অন্ধকারে গাছ-পালা নড়লেই আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে। আর, ভাঙা দরগার কাছে যদি অপদেবতা দেখি তো বোধ হয় মরেই যাব।"

সমীরের মতো গোবেচারীর মুখে এতগুলো কথা শুনে আমরা সবাই অবাক ও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু তারপর আমাদের কথাবার্তায় সে আগ্রহের সঙ্গে আর যোগ দিলে না এবং যেন কি ভাবতে লাগলো।

আমাদের স্কুল থেকে কিছুটা তফাতে সেক্রেটারিবাবুর পাকা বাড়ি। তিনি কাঁটাখালির ইজারাদার। তাই ভারী খাতির।

হেডমাস্টারমশাই সেক্রেটারির বড় ছেলে মদনকে রোজ সন্ধ্যার

পর স্কুলের অফিস ঘরে বসে পড়াতেন। সমীরকেও রোজ সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়ে পড়াশুনো করতে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই আমাদের প্রতিবেশী। তাই সমীরও যেত। পড়াশুনো সেরে সে কোনদিন আসতো তাঁর সঙ্গে, কোনদিন বা আসতো একা। সঙ্গে আলো নিত না, অন্ধকার রাতে, বই চাপড়াতে চাপড়াতে আসতো। এক একদিন তার বই চাপড়ানোর শব্দ দূর থেকে শুনতে পেতাম।

একদিন সে একাই আসছে। রাত তখন আটটা কি তার কিছু বেশি হবে। একে পল্লীগ্রাম। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার। সে পুকুর ও দরগা ছাড়িয়ে রায়েদের পোড়ো ভিটের ধারে আসতেই পাশের আম গাছটার ডাল সর্ সর্ করে নড়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে ঝুর ঝুর করে মাটি ও আরও কি যেন ওপর থেকে ঝরে পড়লো।

সমীর থমকে দাঁড়ালো। তারপর ওপর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তবুও মনে হলো, গাছের ডালে শাদা মতো কি যেন একটা রয়েছে।

সে হাতের বই-খাতা ও পায়ের চটিজোড়া গাছতলায় রেখে কোমর বেঁধে গাছে উঠতে লাগলো। খানিক দূর উঠেই বললে, "হরিপদ নেমে এস। মিথ্যে কষ্ট করছো। আমায় ভয় দেখায়—"

কিন্তু হরিপদের সাড়া পাওয়ার বদলে সে দেখলো অন্ধকার ডালপালার মধ্যে একখানা কিম্ভূতকিমাকার মুখ ঝক্ঝক্ করছে। সে প্রথমটা খুব চমকে গেল। পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে আরও হাত কয়েক ওপরে উঠ্তেই জ্বলন্ত মুখখানা আর দেখতে পেল

না। কিন্তু আগের দেখা সেই শাদা জিনিষটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। সে আবার বললে, "হরিপদ নেমে এস!"

এমন সময়ে সে দেখতে পেল, পুকুরধারে দরগাটার আড়াল থেকে দুল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে এল একটা লণ্ঠন। তার একটু পরেই শোনা যেতে লাগলো কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ। হেডমাস্টারমশাই চাকরের সঙ্গে বাড়ি ফির্‌ছেন।

সমীর আবার বললে, "হরিপদ, নেমে এস। ঐ দেখ আলো হাতে কারা আসছে। বোধহয় মামা। আমি এখনই চীৎকার করবো।"

ওপর থেকে উত্তর হলো, "আমিও বলবো, তুমি আমায় ভয় দেখাতে গাছে উঠেছিলে! আমি তোমায় ধরতেই গাছে উঠেছি।"

সমীর কোন উত্তর না দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লো। হরিপদও তার পিছন পিছন নেমেই অন্ধকারে দিল ছুট।

ওদিকে আলোটাও ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু একেবারে কাছে আসবার আগেই সমীরও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনাটি সমীর পরদিনই আমাদের বলে। শেষকালে বলে, "বুঝতে পেরেছিলাম, সেক্রেটারির চাকর আলো হাতে মামাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আস্‌ছিল! আমি বাড়ি আসবার একটু পরেই মামাও বাড়ি এসেছিলেন।"

হরিপদ কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকেই কিছু বললে না। আমরা জিগ্যেস করলেও সে চুপ করে রইলো এবং সমীরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাতে লাগ্‌লো।

সেদিন থেকে হরিপদর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয় গেল কমে

আর, শয়তানীতে তার চেয়েও উঁচু আসন দিলাম, সমীরকে। তবে মনে মনে আমাদের দুঃখও হলো যে, কাঁটাখালি কোদালচাঁচির কাছে শায়েস্তা হলো!

কিন্তু সমীর কোন রকমের শয়তানী প্রকাশ করলে না, নিতান্ত গোবেচারীর মতো থাকতে লাগলো। শেষে স্কুল বন্ধ না হতেই মহালয়ার দু'দিন আগে সে বাড়ি চলে গেল।

হরিপদ যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো।

তাদের বাড়ির পিছন দিকে ছিল একখানি আমকাঁঠালের বাগান। তার এক জায়গায় ছিল অনেককালের একটি পুরোনো কবর। তার পাকা গাঁথুনি ভেঙে-চুরে খানিকটা মাটিতে বসে গিয়েছিল। আর, তার কাছ থেকে কিছু দূরে ছিল, একটি পুরোনো বেলগাছ। সেদিকে কেউ যেত না। আমরাও যদি কোনদিন ছুট্তে ছুট্তে গিয়ে পড়েছি তো তৎক্ষণাৎ ভয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই নি।

লোকে বলে, আলখাল্লাপরা, মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি এক মৌলবি নাকি জ্যোৎস্না-রাতে ওখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোরানের বয়েৎ আওড়াতেন। তিনি কারো অনিষ্ট করতেন না। কিন্তু বছর কতক থেকে তাঁকে আর দেখা যায় না। তবে কাহিনীটি সমানে চলে আসছে। সবেরই শেষ আছে। কাহিনীর আর শেষ নেই। যত পুরোনো হয় ও যেন ততই সত্য হয়ে ওঠে।

হরিপদদের বাড়ির পিছনদিকের কাহিনী একদিন সমীরও শুনেছিল। তাকে ভয় দেখাবার কয়েকদিন পরে সে হরিপদকে বলে,

"মহালয়ার দিন রাত বারোটার সময় যদি ওই কবরের ওপর বসে থাকতে পারো তবেই বুঝবো তোমার সাহস আছে।"

হরিপদ বলেছিল, "আমি যে বসবো তার সাক্ষী থাকবে কে ?"

সমীর বলেছিল, "কবরের ধারে একটা গাছের ডাল পুঁতে রেখে এস। পরদিন সকালে দলবেঁধে সবাই গিয়ে দেখবে।"

হরিপদ বলেছিল, "আচ্ছা।"

আমরাও সানন্দে তাতে সম্মত হয়েছিলাম।

কিন্তু মহালয়ার আগেই সমীর হঠাৎ চলে গেল।

তবুও হরিপদ বললে, "ও না থাক, আমি কথা রাখবোই। ছুটির পর ও ফিরে এলে তোরা ওকে বলিস্ যে, আমি গিয়েছিলাম।"

মহালয়ার দিন থেকেই আমাদের স্কুল বন্ধ হলো। সেদিন সকাল থেকেই আকাশে ঘন কালো মেঘ করে হাওয়া উঠ্‌লো, সেই সঙ্গে সামান্য বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌লো।

আমরা হরিপদকে বললাম, "তুমি কবরের ধারে যাবে না ?"

হরিপদ বললে, "কথা যখন দিয়েছি, তখন যাবোই! তাতে প্রাণ থাক, চাই যাক।"

এদিকে শেষ বলা থেকেই মেঘ আরও জমাট বেঁধে আকাশ ছেয়ে রইলো। পৃথিবীতে পড়লো তার কালো ছায়া। গাঁয়ের পথ-ঘাট তাতে একেবারে মুছে গেল। কখন দিন গেল, রাত এল, কেউ বুঝতে পারলো না। সারাদিনই বৃষ্টি ও দম্‌কা বাতাস। তারা যেন বেলাশেষের অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ দুটিতে তাণ্ডব শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে উঠ্‌ল ভিজে গাছ-পালার শাখা ও পাতা আন্দোলনের

একটানা শব্দ যেন উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের অবিরাম আর্তনাদ। থেকে থেকে বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো চমক ও মেঘের প্রচণ্ড গর্জন! প্রকৃতির সে রুদ্র মূর্তি দেখে ভয়ে আমাদের বুক কাঁপতে লাগ্‌লো। বাতাসের দমকায় ঘর এক একবার মড়্ মড়্ করে দুলে ওঠে। গাছের ডালে-পাতায়, ঘরের চালে, মাটিতে বৃষ্টির চট্‌পট্ শব্দ; জঙ্গলে, ডোবায়, পুকুরে, খানায় ভেকের উল্লাস-চীৎকার; বাইরে ঘরের ভিজে দাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে কুকুরের কান্না—সব মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, হরিপদর কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলাম! এই রাতে ও যদি কথা না রাখে, ওর দোষ নেই। যদি রাখে, ও অসাধারণ ছেলে। ওর সাহস আমাদের অনুকরণীয়। ওর কাছে কোথায় লাগে, নেলসন!

"কিন্তু হরিপদ পারবে কি?" বসে বসে এই কথা ভাবছি। সময় সেই সাংঘাতিক ক্ষণটির দিকে পলে পলে এগিয়ে যাচ্ছে আর বৃষ্টি বাতাসের বেগ আসছে কমে। কিন্তু বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গর্জন চলছে সমানে।

শেষে সেই সাংঘাতিক ক্ষণটি ঢং ঢং করে ঘড়িতে বেজে উঠলো এবং তার খানিক পরেই একটা ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি, কয়েকটা আলো হরিপদদের বাগানে ঘোরাফেরা করছে। গোলমালটা আসছে সেদিক থেকেই।

অভিভাবকদের নিষেধ উপেক্ষা করে আমরা ছুট্‌লাম সেদিকে। অভিভাবকদেরও কেউ কেউ চললেন আমার সঙ্গে।

গিয়ে দেখি, আমাদের কয়েকজন সঙ্গী, জন কতক প্রতিবেশী ও

হরিপদের অভিভাবকেরা সেখানে উপস্থিত। কয়েকজন হরিপদকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসছেন আর সে চোখ বুজে গোঁ গোঁ করছে।

একজন সভয়ে বললেন, "ওখানে কঙ্কাল এল কি করে?"

বিদ্যুতের ও লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, ভাঙা কবরটির গায়ে ঠেসান দিয়ে একটি মনুষ্যকঙ্কাল এক হাত তুলে বসে আছে।

আর একজন বললেন, "শয়তান জব্দ হয় নিজেরই শয়তানীর প্যাঁচে।"

হরিপদর কিন্তু চেতনা নেই।

তাকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। তখন থেকে সে সেই যে ভুল বকতে আরম্ভ করলো এবং তার যে জ্বর এল তা যতদিন সে বেঁচে ছিল সে সময়ের মধ্যে একটি বারের জন্যেও বিরাম হলো না।

পরদিন লোকে দেখলো, কঙ্কালটি কিছুদূরে একটি খাদে পড়ে আছে।

হরিপদ ছিল পিতৃমাতৃহীন ও দুরন্ত। তবুও তার মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত হলেন। আমরা বহু চেষ্টা করেও জানতে পারলাম না, হরিপদ যে সেই রাত্রে কবরের কাছে গিয়েছিল, তা তার অভিভাবকেরা জানতে পারলেন কি করে।

কিন্তু কিছুদিন পরে খুব অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল, ঐ কঙ্কালটি সমীরের বাবার। তিনি ডাক্তারি পড়বার জন্যে ওটি কিনেছিলেন।

কিন্তু সমীর আর আমাদের গাঁয়ে কোনদিন ফিরে আসে নি। তারপর থেকে আমরাও কোদালচাঁচি গাঁয়ের নাম কোনদিন মুখেও আনতাম না।

মিণ্টুর ছবি—

মিণ্টুর দাদা ছবি আঁকে। কী সুন্দর! পদ্ম, হাঁস, মানুষ, রাজা-রানী, আরও কত কি!

মিণ্টুও একদিন দাদার ছবি আঁকবার সাদা কাগজ কলম আর কালি নিয়ে ছবি একখানি আঁকলো।

ছবির বিষয় হলো, 'মা তার ছোট্ট বোন মিনুকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্চে আর সামনে চুপ করে বসে আছে পুষি।' ছবিখানি কী সুন্দর হলো! মিণ্ট ছুটে গেল মাকে দেখাতে। মা তখন ও বাড়ির বুড়ী মাসীর সঙ্গে বারান্দায় বসে গল্প করছেন আর চুল শুকোচ্ছেন।

মা ছবি দেখেই বললেন, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি, অ্যা? রঞ্জনের বুঝি?"

মিণ্টু বললে, "ছবিখানা সুন্দর হয়নি মা? বল না?"

"রঞ্জনের দরকারী কাগজ-পত্র নষ্ট করচো?"

"নষ্ট করলাম বুঝি? ছবি এঁকেচি তো! সুন্দর হয় নি?"

"ছাই হয়েচে। ভূত আঁকা হয়েচে। সে এসে তোমায় কি করে দেখো! শিগ্‌গির রেখে এস তার কলম। আর কখ্‌খন ওতে হাত দিয়েচো কি মজা দেখবে।"

বুড়ী মাসী বললেন, "আহা! কেন বকচো বাছা! ও কি বোঝে? দেখ তো মুখখানা কেমন হয়ে গেল!"

মিণ্টু কাঁদ-কাঁদ মুখ করে ফিরে এলো। এত সুন্দর ছবিখানা!

মা বললেন, ভূত আঁকা হয়েচে! ভূত কি এই রকম দেখতে? সে দাদার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ছবিখানা রেখে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, রাতের বেলা চিলেকোঠায় এই রকম ভূত ঘুরে বেড়ায়? ও দিক্‌কার বেলগাছে যে ভূতটা থাকে সে কি এই রকম? সে ভূত এঁকেচে?

পাশের ঘরে দিদি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল।

মিণ্টু সেখানে গিয়ে দিদির পাশে দাঁড়িয়ে তার সামনে বইয়ের ওপর ছবিখানি রাখতেই দিদি খিঁচিয়ে উঠলো, "কি হচ্চে? নিজেও পড়বে না, অন্যকেও পড়তে দেবে না!"

"লক্ষ্মীটি দিদি! দেখ না ভাই—"

"কি দেখবো?"

"ছবিখানা কেমন হয়েচে?"

"বাঁদর হয়েচে! যা, ভাগ্—"বলে ছবিখানা ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে আবার একমনে পড়তে লাগলো—'দূষিত জল পান করিলে, টাইফয়েড, আমাশা, গলগণ্ড বা কৃমি প্রভৃতি রোগ হয়।'

মিণ্টু কাঁদ-কাঁদ মুখে ছবিখানা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। মা বললেন, ভূত! দিদি বললে, বাঁদর! বাঁদর যে হয় নি তা সে জানে। কারণ, সামনের পানওয়ালার যে বাঁদরটা আছে, রাস্তায় যে বাঁদর খেলা দেখায় সে এ রকম দেখতে নয়। চিড়িয়াখানার বাঁদরের চেহারার সঙ্গেও এর মিল নেই।

কিন্তু এ তো মা, তার ছোট বোন মিনু আর পুষি। কেউই তার মনের কথা বুঝ্‌তে পারচে না!

সেদিন রবিবার। বাবা বৈঠকখানায়। সে ছুটলো সেখানে। কেউ যা বলতে পারে না, বাবা ঠিক তার উত্তর দেন। তারও সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন বটে তবে দু-একটার উত্তর দিতে পারেন না। যেমন, 'বাঘ কুমড়ো খায় কিনা।' 'হাতী পাঁটা খায় না কেন?' 'উইচিংড়ি চিংড়ির কে হয়?'—সেদিন এ সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন নি।

সে গিয়ে দেখলো, বাবা একমনে একখানি মোটা বই পড়চেন।

সে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "বাবা!"

বাবা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ!"

মিণ্টু বইয়ের ওপর ছবিখানা রেখে বললে, "বাবা, দেখ তো ছবিখানা কেমন হয়েচে?"

"ছবি? কে এঁকেচে?"

"আমি।"

বাবার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিল; জিগ্যেস করলেন, "কি এঁকেচো?"

"এই মা, এই মিনু, আর ঐ পুষি। মা মিনুকে দুধ খাওয়াচ্চে আর পুষি বসে বসে দেখচে—"

বাবা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

"কেমন হয়েচে?"

"কেমন হয়েচে? কিন্তু দুধের বাটি কৈ?"

"ওঃ! ভুলে গেচি।" বলেই খপ্ করে বাবার লাল-নীল পেনসিলটা তুলে নিয়ে নীল দিয়ে একটি গোল এঁকে বললে, "এই যে—"

বাবা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "মাকে দেখাও গে—"

"মাকে দেখিয়েছিলুম, মা বললে, 'ভূত হয়েচে,' দিদি বললে, 'বাঁদর হয়েচে'। ভাল হয় নি বাবা ?"

"তুমি দাদার কাছে ছবি আঁকা শিখ—"

"বল না, ভাল হয়েচে কি না ?"

"দাদাকে দেখিও—এখন যাও।" বলে বাবা তার গাল টিপে আস্তে পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন।

অমনি দাদার ঘর থেকে হাঁক এল, "মিণ্টু—এই মিণ্টু—আবার আমার জিনিষে হাত দিয়েচিস্ ?"

মিণ্টু আবার বৈঠকখানায় ঢুকে বাবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্যানডাল চট্ চট্ করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকে দাদা বললে, "আমার চাইনিজ্ ইংকের শিশিটা ভেঙেচিস, কলমটা ভোঁতা করেচিস, কাগড় ছিঁড়ে নিয়েচিস—তোকে না বারণ করেচি আমার জিনিষে হাত দিতে ? কেন এ সব করেচিস্ ?"

মিণ্টু ফ্যাল-ফ্যাল করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "তোমার মতো ছবি আঁকছিলুম।"

দাদা হঠাৎ মুখে রুমাল পুরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিণ্টুও হতভম্বের মতো ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

তার ধারণা হলো, ছবিখানি খারাপ হয়েচে। সে আর দাদার ছবি আঁকবার কিছুতে হাত দেবে না।

কিন্তু পরদিন থেকে দেয়ালে, নিজের পড়ার বইয়ে, খাতায়, বাবার দামী বইয়ের সাদা পুস্তানিতে মিণ্টুর আঁকা নানবিষয়ের ছবি দেখা যেতে লাগলো। এজন্যে কেউ তার প্রশংসা করলে না, বরং কানমলা, চাঁটি ও বকুনি দিতে লাগলো।

শেষে তার বাবা দাদাকে ডেকে বললেন, "ওতে হবে না। ওকে আঁকতে শেখা—"

দাদা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে অগত্যা তাতেই রাজী হলো। মিণ্টুরও ছবি ক্রমে বহির্জগৎ থেকে খাতায় গিয়ে ঢাকা পড়লো এবং এখনও সেখানে সত্যিকারের ছবির রূপ নিচ্চে।

মা তাই-ই দেখে একদিন বললেন, "বাঃ! মিণ্টু কী সুন্দর ছবি এঁকেচে!"

মিণ্টু একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নিচু করলো। তাই বলে সে ছবি আঁকা শেষ করে নি।

চাঙড়ীপোতার চণ্ডীভূত

রাত তখন আটটা হবে—

আসরটা খুব জমাট। বৃষ্টিও ঝেঁকে এল। শচীন হাত তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে—"এই সব! শোন আমার কথা! এটা সত্যিকারের ভূতের গল্প। ভূতটাকে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

ফণী বল্‌লে—"তোর চোখে ত মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা। তুই যতটা দেখিস্ তার চেয়ে দশগুণ করিস্ কল্পনা।"

পূর্ণ গল্প ভালবাসে, বল্‌লে—"আহা! শোনই না। সবটাই কি আর মিছে কথা হবে?"

শচীনের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল; বললে—"মিছে কথা বলতে ওস্তাদ তুমি। ওতে যদি কোন প্রাইজ থাক্‌ত তাহলে তুমি পেতে প্রথম পুরস্কার এবং ঐ সঙ্গে একটা এক্‌সট্রা মেডেলও। আমি যা বল্‌ছি, এর শতকরা এক শ' ভাগই সত্যি—"

বরদা বল্‌লে—"চট কেন? আমরা কেউ কিছু ত বলছি না। তবে ভূতটুথ—!"

শচীন হাত নেড়ে বললে,—"বল্‌ছি ত একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

—"ভূত?"

—"হাঁ। রিয়াল গোস্‌ট্! আমাদের বাড়িতে সেই যে চাঙড়ী-পোতার চণ্ডী আসত, দেখেছ ত? সেই যে কালো, রোগা, ঢ্যাঙা,

চোখ দুটো বড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ডান পা-খানা একটু ছোট বলে দানঙচে চল্‌ত—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"হাঁ—হাঁ—সেই—সেই—যে খুব কাঁঠাল খেতে পারত ?"

—"ধ্যেৎ! কাঁঠালের সময় সে কোনদিন আসেই নি। আস্‌তো পৌষমাসে—"

পূর্ণ খাটো গলায় বল্‌লে—"পিঠে খেতে!"

কিন্তু স্বর খাটো হলেও তার হুলটুকু গিয়ে বিঁধল শচীনের মনে। সে কট্‌মট্‌ করে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে বলল— "ও খুব মাছ ধরতে ভালবাসত। গ্রীষ্মের পর একটু বর্ষা পড়লেই চারের পোঁট্‌লা আর ছিপ হাতে চণ্ডী সেই কোথায় তিন ক্রোশ দূরে ষষ্ঠীডাঙার ঘোষেদের পুকুরে, সাতমাইল দূরে কুমীরখালীর জোড়াদীঘিতে, দু ক্রোশ দক্ষিণে বাবুহাটির বিলে, তার এধারে শঙ্খপুরের ঝিলে—"

পূর্ণ বল্‌লে—"চাঙড়ীপোতার ঝোপে, বারুইপুরের জঙ্গলে—"

শচীন তাতে কান না দিয়ে বলে উঠল—"মাছ ধরতে যেত। ওর সঙ্গে মাছের কেমন একটা যোগ ছিল। যেখানেই যাক, যে দিনই ধরুক, ওর হাতে মাছ উঠতই। আমরা যে পুকুরে চার দিয়ে ছিপ ফেলে তিন দিন বৃথা বসে থাক্‌ব, একটা মাছও বঁড়সী টানবে না, ও সেখানে মাত্র একঘণ্টা বসেই হয়ত দশ সেরা এক রুই, কি পনেরো সেরা এক কাৎলা তুলে ফেলত। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!'

পূর্ণ বল্‌লে—"এই থেকে প্রমাণ করা যায়, ও গত জন্মে বেরাল বা ভোঁদড় ছিল—"

নারাণ ডাক্তারী পড়ছে; সে জন্যে তার ধারণা প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সে বল্‌লে—"নীল শ্বেত ভাল্লুকও হতে পারে। আবার কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়—"

পূর্ণ ও নারাণের দিকে শচীন একবার ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে—"তা সেবারও গ্রীষ্মের পর রীতিমত বর্ষা এল। জলাগুলো উঠল জলে ভরে, মাঠে মাঠে ঘাস উঠল গজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল ঘন হলো, গাছ-পালা হলো শ্যামল, সতেজ। আকাশে সারা দিনরাতই মেঘের মেলা। সেই সঙ্গে চণ্ডীটাও উঠল ক্ষেপে। রাঙা পিঁপড়ের বাসা ভেঙে, বোলতার চাক পেড়ে, মেদি গুঁড়িয়ে, সুজি ভেজে সে শিকারের আয়োজন করতে লাগল। তাদের চালের বাতায় ছিপ, কাঠের বাক্সে হুইল, সূতো ও ছটা বঁড়সী ছিল। সে সব পেড়ে, বার করে, ঘোষেদের একটা রাজহাঁসের পালখ ছিঁড়ে তাই দিয়ে ফাৎনা তৈরী করে, চায়ের মোড়কের রাংতা গালিয়ে তার ভার লাগিয়ে তিন দিনে তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু কোথায় যে মাছ ধরতে যাবে তা কারুকে বল্‌লে না।

"সেদিন ভরা অমাবস্যা। সকাল থেকেই আকাশভরা কালো মেঘ। মাঠের শেষে দূরে তাল-নারিকেলের শ্রেণী। সেগুলোও কালো দেখাচ্ছে। মাঠখানাকেও লাগছে কালো মতো! বাতাসও বইছে ভিজে ও এলোমেলো। ভোরের দিকে ত এক পশ্‌লা বৃষ্টিই হয়ে গেল। চাঙড়ীপোতায় আমার মামার বাড়ি। কলকাতা থেকে সেখানে আম খেতে গেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি, মামাদের বাগান ফাঁকা। আম ত ফলেই নি, যে ক'টা ফল ছিল. সেগুলোও বাঁদরে খেয়ে গেছে, তবুও সকালে উঠেই আঁকষি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।

"বাগানের পাশ দিয়ে মাঠে যাবার পথ। গাছের তলায় তলায় বৃথা ঘুরে, বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি চণ্ডী। তার একহাতে ছিপ, আর এক হাতে গামছায় পোঁট্‌লা করে বাঁধা চার, টোপ, বগলে বাঁশের বাঁটওয়ালা ছাতা, গায়ে আধময়লা লঙ ক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে রবারের জুতো। আমাকে দেখেই সে একগাল হেসে বললে—'শচীদা! সকালে উঠেই গাছ ঠেঙাতে বেরিয়েছো ?'

"চণ্ডীটা আমাকে বারবরই বড় ভক্তি করত। আমি ওর ঠিক আড়াই বছরের বড়।

নারাণ বললে—"হাঁ। তার ঐ কথাগুলো ভক্তেরই উপযুক্ত বটে।"

পূর্ণ বললে—"এবার আমি কিন্তু কিছু বলি নি-—"

বরদা বললে—"আহা-হা! বাধা দাও কেন ? তারপর বল—"

শচীন বললে—"তার উত্তরে বললাম—আমি ত ভোরে উঠেই গাছ ঠেঙাচ্ছি, তুই-ই বা কোন দুপুরে ছিপ হাতে বেরিয়েছিস্? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি ?

"সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত তুলে বললে—'সেই পোড়ো-দীঘিতে।"

"কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। বললাম—'বলিস্ কিরে! সে যে ভূতের আড্ডা। ওখানে কত লোক যে অপঘাতে মরেছে তার হিসেব নেই। আজ পর্যন্ত ও পুকুরে কেউ—ফিরে যা, ফিরে যা—

"চণ্ডী হেসে বললে—'ভূত বলে কিছু নেই শচীদা! একেবারেই কিছু নেই। তুমি দেখ, আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসব। খালি হাতে

নয়, অন্ততঃ দশ সের ওজনের দু'টো রুই ঝুলিয়ে। এই ব'লে রাখছি, সকলের প্রথমে যে মাছটা ধরব, সেটা তোমার।

"—না রে চণ্ডী, এমন কাজও করিস্ নি। ওখানে কি মানুষ যায় ?

"চণ্ডী অবশ্য শুনলে না; একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেল। আমি তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছে। 'পোড়ো দীঘিটার' এক ক্রোশের মধ্যে কোন মানুষ যেতে সাহস করে না। কোন গরুও সেদিকে ঘাস খেতে যায় না; এমন কি, রাতের বেলা শেয়াল-কুকুরও সেদিক থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। কেবল চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচারাই সেখানে রাত কাটায়। আর ও কি না একা সেখানে মাছ ধরতে যাবে !

ফণী বললে—"কেন ?"

—"এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ? দীঘিটা যে কত কালের এর হিসেব ও অঞ্চলের কোন জমীদারেরই সেরেস্তায় নেই। কেউ বলে, আলাউদ্দিন খিলিজির সময়ের, কেউ বলে আকবর বাদশার আমলের, আবার কেউ বলে, ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন ছিল তখনকার। ওখানে নাকি এক সাহেব থাক্ত। কিন্তু আমার দাদামশায় বলেন, ওটার বয়স মাত্র একশ' দশ বছর। ওখানে রতনা ডাকাতের আড্ডা ছিল।

"রতনা ছিল, আবার তাঁর দাদামশায়ের স্যাঙাৎ। ডাকাতি করত রতনা, কিন্তু তাতে ভাগ বসাতেন আমার দাদামশায়ের দাদামশায়। সে পয়সায় তিনি জমীদারী কিনেছিলেন। অবশ্য সে জমীদারী ও

জমীদার-বাড়ি এখন আর নেই। কেবল দাদামশায়ের ঘরে একটা পেল্লাই কাঠের সিন্দুক, একখানা মরচে ধরা ভোজালী, আর একখানা পোকায় কাটা জামিয়ার পড়ে আছে। যাক্;—নিজেদের ঘরের কথা না বলাই ভাল।

"রতনা পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের গলায় পাথর বেঁধে ঐ দীঘিটাতে ডুবিয়ে মারত।

দ্বিজেন বললে—"এত পাথর সে পেত কোথায়? চাঙড়ীপোতা ত পাথুরে জায়গা নয়।"

বরদা বললে—"আরে বাপু! গল্পটা শোনই না।"

শচীন বললে—"একবার এক বুড়ী আর তার ছেলেকে রতনা ত ধরে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে ছিল, খান দুই সোনার গয়না, গোটা দশেক টাকা। বুড়ীর ছেলেটা ছিল বেশ ষণ্ডা গোছের। রতনার লোকের সঙ্গে তার বেশ একটু লাঠি-বাজি হলো। ফলে, লোকটার নাকটা একদম মুখের ওপরে গেল বসে। রতনা এই অপমান ও ক্ষতির শোধ নেবার জন্যে বুড়ীর চোখের সামনে ছেলেটাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারলে।

"বুড়ী তখন আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললে—রতনা, যদি ভগবান থাকে, তুই-ও একদিন দম আটকে মরবি। তোর সদ্গতি কোন কালেই হবে না—!

"দাদামশায় বলেন, তাঁর দাদামশায় নাকি বলেছিলেন, বুড়ীর শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। রতনা একদিন ঐ দীঘির ধারে দালানটার মধ্যে দম আটকে মরে। কি ক'রে, তা আর বলেন নি। সেই

থেকে নাকি রতনা ওখানে ভূত হয়ে আছে। চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচা ছাড়া রাতের বেলা যে ওদিকে যায়, রতনা তারই গলা টিপে মারে। বেঁচে থাকতে বেটার যে অভ্যাস ছিল, মরবার পরেও সে স্বভাব ঘুচল না! ঐ যে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'—এ তারই ভৌতিক প্রমাণ। যাক্।

"দাদামশায় তখন ছোট, একবার দীঘিটার ধারে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যাঙাতের নাতি বলে রতনা তাঁকে কিছু বলে নি। তবে দাদামশায়কে স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিল—ওদিক আর কখন মাড়াস নি!

"সত্যি কথা বল্‌তে কি, দাদামশায়েয় শেষের কাহিনী আমি বিশ্বাস করি নি। কেননা তিনি ডেলা ডেলা আফিং খান।

"চণ্ডীটার জন্যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি যে করা যায়, ভাবতে ভাবতে তার দাদার কাছে গিয়ে খবরটা জানালাম। শুনেই তিনি জ্বলে উঠ্‌লেন; বললেন—ভূতের কিল খেয়ে আজ ওর শিক্ষা হ'ক। আমরা ত কিছুতেই ওকে সায়েস্তা করতে পারলাম না।

"বললাম—ভূষণ্ডীদা, শিক্ষা ত পরে; তার আগে যে প্রাণহানির—

"ভূষণ্ডীদা জিভ দিয়ে তালুতে চক্ করে একটা শব্দ করে বললেন—চণ্ডের প্রাণ নেবে ভূতে? এমন বাহাদুর ভূত আজও প্রেতলোকে জন্মায় নি—!

"এর ওপর আর কি বল্‌ব? বাড়ি এসে চুপ্ করে বসলাম।—" বলে শচীন থাম্‌ল।

বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দূরে কোন অট্টালিকার

মাথায় যেন বাজ পড়ল। বৃষ্টি ও বাতাস মেতে উঠেছে। শার্সিগুলোর গায়ে এসে দুটোতেই মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—তারপর—"তারপর ?"

শচীন বললে—"চণ্ডী ত চলেছে—

পূর্ণ বললে—"তুমি কি করে জানলে ?

শচীন হাত নেড়ে, ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে—"আরে, এটা ত আস্ত 'ইডিয়ট' দেখছি। চণ্ডী যে তখন চলেছে, এ কথা কে না জানে ?

সকলে বলে উঠ্‌ল—"ঠিক—ঠিক। বলে যাও, বলে যাও—"

"চণ্ডী আলের ওপর দিয়ে চলছে। তার দুধারে শস্যশূন্য ভিজে ক্ষেত। চাষীরা কোন কোন ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। ক্ষেতের এখানে সেখানে দুটি তাল একটি গাছ। বিশ্বনাথের মন্তরভরা মাদুলীর মতো তাদের মাথায় জটার মধ্যে একটি করে কলসী বাঁধা। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গ্রাম। কালো মেঘের গাঢ় ছায়ায় সেগুলো ঝাপসা হয়ে আকাশের তলে মিশে আছে। চাণ্ডড়ীপোতা থেকে 'পোড়ো দীঘি' পূরো আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, আর সেখান থেকে সয়লা গাঁয়ের নদীটা এক ক্রোশ দূরে।

"চণ্ডী মাঠ ভেঙে দীঘিটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন বেলা ন'টা হবে।

"দীঘির চারধারে ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে তাল, নারকেল ও কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ। চণ্ডী শুনেছিল, সেখানে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু কৈ—কিছুই ত—ঐ যে একটা দালান। চণ্ডী সেখানে থেকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। দালানটার ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে,

একধারে দেওয়াল ধ্বসে খান কয়েক কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে। ছাদের ভাঙ্গা আলসেয় কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ, নিচে চারধারে ঘন ঝোপ জঙ্গল। তার মাঝ থেকে কি একটা লতা যেন ওপর দিকে উঠে দালানটার এক দিকে ঢেকে রেখেছে। দালানটার দিকে তাকিয়েই চণ্ডীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। কিন্তু দিনের বেলায় কিসের ভয় ?

"সে জঙ্গল ঠেলে দীঘিটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। জঙ্গলের জলে যে তার কাপড়-জামা ভিজে গেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। তার সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। তার প্রায় অর্ধেকটা পদ্মবন, বাকীটুকু কলমী, হেলঞ্চ, পানায় ভরা। হঠাৎ একটা বড় মাছ ঘাই দিয়ে উঠল। সেই সময় চণ্ডী দেখলে, দীঘিটার জলের রঙ একটু লাল। কিছুদূরে এক জোড়া বক বসেছিল। চণ্ডীর সাড়া পেয়ে তারা মোটা গলায় বকর্‌ করে ডেকে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ওপারে শেওড়াগাছটার মাথায় বসল !

ফণী বলে উঠ্‌ল—"এই যে বললে, সেখানে যা যায় রতনা তারই গলা টিপে মারে ?"

শচীন বল্‌লে—"তোর শরীরটা যেমন মোটা, বুদ্ধিটাও তেমনই ভোঁতা। কাক-চিল-বক অর্থাৎ কোন রকম খেচরকেই মারে এমন সাধ্য ভূতের বাপেরও নেই।"

ক্ষিতীশ রোগা মানুষ ; এতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল। পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বল্‌লে—"এরোপ্লানও ত খেচর। তাকেও—?"

শচীন বল্‌লে—"চুপ কর উইচিংড়ি ! তোকে আর চিড়িং চিড়িং করতে হবে না। বেশ, তোমাদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, আমি আর—"

সকলে বলে উঠ্‌ল—"বল—বল। চণ্ডী তার পরে কি করলে?"

"চণ্ডী দীঘির ধারে একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তার ছাতা, ছিপ আর পোঁটলাটা সেখানে রাখলে। তারপর পোঁটলাটার ভেতর থেকে, ছোট কাটারীখানা বার করে খানিকটা জায়গার জঙ্গল কেটে জল থেকে কলমী, হেলঞ্চ ছিঁড়ে পরিষ্কার করে চার ফেলে, টোপ গেঁথে বঁড়সীটা হাতে দুলিয়ে জলে ফেলবার সময় একবার বাড়িটার দিকে তাকালে। তার মনে হলো, ডান দিকের ঘরখানার মধ্যে কে যেন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে; আর তার চোখ জোড়া আগুনের ফুলকীর মতো জ্বল্‌ছে। দেখেই চণ্ডীর বুকটা একটু কেঁপে উঠ্‌ল। তবুও সে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল—সত্যি কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কি না। মিনিট খানিক পরে লক্ষ্য করে আর কিছুই দেখ্‌তে পেল না। ওটা মনের ভুল ভেবে চণ্ডী ছিপ ফেলে খান কয়েক কচু আর ভাঁটপাতা বিছিয়ে তার ওপর বস্‌ল।

"চণ্ডী ত ছিপের বাঁটটা পা দিয়ে চেপে চুপ্‌ করে বসে আছে।"

"চারধার নিস্তব্ধ নির্জন। ভিজে মাটি, পচা ডালপালার গন্ধ নাকে লাগছে। কচুবনে মশার ঝাক করছে—"পোঁ, পোঁ।" দীঘির ওপারে একটা তালগাছের মাথায় বসে একটা দাঁড়কাক থেকে থেকে ডেকে উঠ্‌ছে—"আহা—কাহা; আহা—কাহা।" মাঝ দীঘিতে একটা মাছ ঘাই দিয়ে উঠ্‌ল; পদ্মবনের আড়ালে একটা ভীড় ভীড়ে পাখী শিষ দিলে—"টিটির্‌র্‌র্‌—চিট্‌।"

"চণ্ডীর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন নিস্তব্ধতা সে আগেও অনেক দিন অনুভব করেছে। কিন্তু আজকের স্তব্ধতাকে বোধ হতে

লাগল—যেন পাষাণের মতো বিষম ভারী। কিছুতেই এটা নড়ানো বা সরানো যাবে না। ক্রমেই যেন তা তার বুকের ওপর চেপে বসছে। বাতাস স্থির ; আকাশে মেঘদল স্থির হয়ে আছে ; একটি ছোট পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, জলও শান্ত। কেবল একটা মোটা খড়কের মতো হলদে রঙের ফড়িং অর্ধমগ্ন ফাৎনাটার ওপর বার বার উড়ে বস্ছে।

"চণ্ডী আন্দাজে ঠিক করলে, বেলা তখন বারোটা। সে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিপ ফেলে বসে আছে। অথচ একটা মাছও—কথাটা শেষ না না হতেই সে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠ্ল।

"জলের মধ্যে থেকে পানা ঠেলে ভেসে উঠছে ওটা কি ? জিনিষটার রঙ কালো ; দেখ্তে কতকটা পোড়া কাঠের মতো। সেটা তার দিকেই ধীরে এগিয়ে আস্ছে দেখে চণ্ডীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। সে এত কাল মাছ ধরছে, এমন ত কখন হয় নি। সে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে জিনিষটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু সেটা একেবারে কূলের কাছে এল না, মাত্র কিছুদূর এসে হঠাৎ পদ্মবনের দিকে ঘুরে গেল। ঐ যে পিঠের কাঁটা, ঐ যে লেজ, ঐ হাতীর কানের মতো কান্কো নড়ছে। ওটা রুই মাছ! এত বড় রুই মাছ! চণ্ডী বিস্ময়ে, আনন্দে দু পা এগিয়ে যেতেই দেখ্ল তার ফাৎনাটা একটু নড়ে উঠল। সে চট্ করে একবার পদ্মবনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মাছটা কোথায় ? কিন্তু সেটাকে আর দেখতে পেল না, ভাবলে ঐ মাছটাই কি ঘুরে এসে তার বঁড়সী টানছে ?

"ফাৎনাটা ক্রমেই জোরে ডুবছে ভাসছে চণ্ডী সে দিকে তীক্ষ্দৃষ্টি রেখে, ছিপটা দুহাতে শক্ত ক'রে ধ'রে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। তার

বাঁ গালে, ডান কানে যে দুটো কালো রঙের মশা বসে রক্ত চুষতে চুষতে ফুলে উঠছে, দীঘিপারে তালবনের মাথায় মেঘে মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই—

ক্ষিতীশ মুচকি হেসে বললে—"সে এক মনে ফাৎনা দোলা দেখছে—"

শচীন এতক্ষণ তার দিকে মুখ করে গল্প বলছিল; এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"এটা দেখছি, পূর্ণর স্যাঙাৎ—"

পূর্ণও তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র একটি দংশন করলে; মিহি গলায় বল্‌লে—"যেমন তোর দাদামশায়ের দাদামশায় ছিল রতনার স্যাঙাৎ—"

শচীনের সারা গা যেন জ্বালা করতে লাগল। সে চোখ-মুখ রাঙা করে বললে—"তার মানে?

বরদা বল্‌লে—"আহা! কি ছেলেমানুষী করছ? হাঁ—হাঁ—বল—"

"এ রকম করলে বলা অসম্ভব। যদি শুন্‌তে চাও, কেউ একটি কথাও কইতে পাবে না।"

"বেশ। এই আমরা মুখে চাবি দিলাম।"

তবুও শচীন একটু চুপ করে রইল; তারপর আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"ফাৎনা ত ডুবছে-ভাসছে। শেষে যেই একবার তল হলো, চণ্ডীও মারলে সজোরে টান। সঙ্গে সঙ্গে 'কর‍র্‌র্' শব্দে হুইলের সুতো খুলে মাঝ দীঘিতে মাছ ছুটে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তালবনের ওপর থেকে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টি এল ছুটে। দেখতে দেখতে বৃষ্টিধারায় সব মুছে গেল। ওদিকে মাছও ছুট্‌ছে।—একবার ডানধারে, একবার বাঁ ধারে, কখন-কখন সোজা মাঝ দীঘিতে।

ছিপের মাথা বেঁকে বঁড়সীর মতো হয়ে গেছে। মাছটা থেকে থেকে পদ্মবনের সেঁধবার চেষ্টা করছে। চণ্ডীরও জেদ তাকে কূলের কাছে আন্‌বেই। এক একবার তার মনে হয়, বুঝি ছিপখানা ভেঙে গেল।

"এই টানাটানিতে প্রায় ঘণ্টা চারেক কেটে গেল। এর মধ্যে বৃষ্টি একবারও ছাড়েনি বরং আরও ঝেঁকে এসেছে। চণ্ডীর অবস্থা তখন—

—"ভিজে বেরালের মতো—"

কিন্তু টিপ্পনীটা যে কে কাটলে, শচীন তা ধরতে পারলে না। সকলেরই মুখ গম্ভীর। তবুও তার সন্দেহ হতে লাগ্‌ল, এ পূর্ণ কিংবা ক্ষিতীশের কাজ। যাই হোক, না থেমে সে বলে চলল—"একে মাছের সঙ্গে টানাটানি করে সে ক্লান্ত, তার ওপর মূষলধারে বৃষ্টি, আর সেই রকম ভূতুড়ে জায়গা। সে মাঝে মাঝে ম্রিয়মান হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মাছটার লেজ বা পিঠের কাঁটা যেই ভেসে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি পায়। এমনই করে বেলা যখন যায় যায় তখন সে মাছটা ডাঙায় তুললে কিন্তু এমন একটা শিকার লাভ করেও তার মনে আনন্দ হলো না। সে যা আশা করেছিল, মাছটা তার কিছুই না। একটা সাড়ে পনের সের ওজনের কাৎলা মাত্র। তার প্রকাণ্ড মাথা ও মস্ত মুখ দেখে মনে হতে লাগল, যেন একটা রাক্ষসের ছানা।—" বলে শচীন চুপ করলে। বাইরে তখনও ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়েছে।

তারপর আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। চণ্ডী এতক্ষণ দেখে নি, ওপারে দীঘির ডান কোণে একটি সরু নালা ছিল। সেটা দিয়ে হুহুশব্দে মাঠের জল এসে দীঘিতে পড়ছে।

তাতে দীঘিটা কানায় কানায় ভরে উঠছে। চণ্ডী ছিপ গুটিয়ে বাকি টোপ ও চারগুলো দীঘিতে ফেলে, মাছটাকে গামছায় বেঁধে বহু কষ্টে দীঘির পাড়ে উঠেই দেখে, চারধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। কিছুদূরে যে জঙ্গলটা ছিল সেটাও আর দেখা যায় না। চণ্ডীর বুক কেঁপে উঠ্ল। সর্বনাশ! সয়লা নদীতে বান এসেছে নাকি! ছেলেবেলায় আমি আর চণ্ডী একবার সয়লা নদীর বান দেখেছিলাম। সেবার চাঙড়ীপোতার অবস্থা হয়েছিল একটা প্রবালদ্বীপের মতো। সেই স্মৃতি চণ্ডীকে বিচলিত করলে। এই জলস্রোত ঠেলে আড়াই ক্রোশ যাওয়া একেবারে অসম্ভব। হয়ত পথের মাঝে মাঝে জল আরও বাড়বে। সে-যে কি করবে ঠিক করতে পারলে না। সেই সময় একবার ভয়ঙ্কর শব্দ করে দূরে একটা তালগাছের মাথায় বাজ পড়ল।

"শব্দ আর আলোর ঝোঁকটা কাটিয়ে সে একবার পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখল, তার বারান্দার সামনে ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। প্রথমটা সে ভাবলে মনের ভুল। তারপর আবার সেদিকে তাকাতেই দেখলে, সত্যিই একটা লোক। ঐ যে সে হাতছানি দিতে দিতে ঘরের ভেতর দিকে চলে গেল। তবে কি এখানে লোক বাস করে? ভূতের গল্পটা একদম বাজে? সম্ভবতঃ লোকটা তার দুর্দশা দেখে, তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু লোকটার স্বভাব ভাল ত? যদি ডাকাত হয়? অবশ্য ডাকাত হলেও তার তখন কিছু করবার ছিল না। তার কাছে মাছটি ছাড়া মূল্যবান্ আর কিছুই নেই। সে আর কালবিবম্ব না করে বাঁ-হাতে মাছ, ডান হাতে দা, বগলে ছিপ, আর

কাঁধে মাথা দিয়ে ছাতাটা চেপে ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল।

"জঙ্গল ঠেলে মিনিট পাঁচেক চলে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চণ্ডী উঠোনে গিয়ে পড়ল। সামনেই বারান্দা আর সেই ঘরখানা। কিন্তু কৈ কাউকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে না; বারান্দায় উঠবার সিঁড়িগুলো ভেঙে পড়েছে; বারান্দায় জঙ্গল। এ রকম জায়গায় কি করে মানুষ থাকে? এবার তার মনে একটু ভয় হলো; ততক্ষণে আর একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাতাস যেন আরও মেতে উঠেছে। সে আর না এগিয়ে সেখান থেকে চীৎকার করে ডাকল—'কে আছেন? ভেতরে আছেন কে?'

"চণ্ডীর মনে হয়, ভেতর থেকে যেন উত্তর এল—'ভেতরে আসুন!'

"চণ্ডী তৎক্ষণাৎ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে ওপরে উঠে বারান্দা পার হয়ে ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বল্‌লে—'আমি এসেছি।'

"চণ্ডীর মনে হলো, তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা যেন এধার থেকে ও ধারে সরে গেল আর ঘরের মধ্যে কে যেন কাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।

"চণ্ডী আবার বললে—'কে আছেন মশায়? কে আছেন?'

"আবার উত্তর হল—'চলে আসুন।'

"সামনে অন্ধকার ঘর, বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে সজল বাতাসের হাহাকারে চণ্ডীর মন যেন কেমন হয়ে গেল। যে ডাক্‌ছে সে ত কৈ এগিয়ে আস্‌ছে না; ভেতরে কোথাও একটু

আলোও ত দেখা যায় না। সে আবার বল্‌লে—মশায়, বড় অন্ধকার! একটা আলো।

"ভেতর থেকে উত্তর হলো—'এগিয়ে আসুন।'

"চণ্ডী সাহসে ভর করে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে হাত কয়েক এগিয়ে যেতেই তার মনে হলো, কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে খিল খিল শব্দে হেসে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে চণ্ডীর পায়ের নিচে মেজেটা একবারে হাত পাঁচ-ছয় গেল বসে। চণ্ডীও সেই সঙ্গে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল। এমন আচম্বিত দুর্ঘটনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবুও তৎক্ষণাৎ উঠবার চেষ্টা করতেই সে দেখল, একখানা কঙ্কাল তাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে। দেখেই সে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।"

ফণী বললে—"নিশ্চয়ই 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?"

শচীন বললে—"চণ্ডীর মা নেই। ইয়ারকি রেখে শোন। তারপর সন্ধ্যা হইতেই আমরা ত ভেবে অস্থির। কিন্তু তখন চণ্ডীর সন্ধানে সেই ভূতুড়ে বাড়ির দিকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। জলটা আবার বাড়ছে। তবুও সকলে আশা করতে লাগলাম, চণ্ডী এল বলে। কিন্তু ক্রমে রাত বেশি হতে লাগল, তবুও চণ্ডীর দেখা নেই! শেষে রাত যখন বারোটা, জলটা তখন একদম ধরে এল, কিন্তু বাতাস শান্ত হলো না। সে চারধার থেকে বন্যার কল্লোল বয়ে পাগলের মতো গ্রামের শূন্য অন্ধকার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমরা আর কি করব? চণ্ডীদের বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বসে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

"ক্রমে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আমরাও চণ্ডীর খোঁজে তৎক্ষণাৎ বার হলাম, সংখ্যায় সতেরো জন।

ক্ষিতীশ আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—"কিসে?"

শচীন বল্‌লে—"ডোঙায়—"

পূর্ণ বললে—"তালগাছ বুঝি কাটাই ছিল?"

শচীন বললে—"সকলেই তোর মতো মিছে কথা বলে না। চাঙড়ীপোতার ব্যাপার তুই কি জানবি? থাকিস্ ত বস্তিবাটিতে, তোরা শোন্। চারধারে জল—যতদূর দেখা যায়—জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তার ওপর দিয়ে টরপেডো-বোটের মতো আমাদের সতেরখানা ডোঙা চলেছে। বল্‌লে বড়াই করা হবে, সেই সার্চপার্টির ক্যাপ্টেন ছিলাম আমিই।

বরদা লাঠি খেলে; বললে—"সাবাস্!"

"আমি জানতাম, কোথায় চণ্ডীর খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই সকলকে সেই দীঘির দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। স্রোত ঠেলে, জল কেটে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ উঠেছে, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেল। এর মধ্যে চণ্ডীকে পাব কোথায়! মনের ভাব গোপন করে সকলকে বললাম—'ঐ বাড়িটার ভেতর চণ্ডের খোঁজ করা যাক্ চল—'

"হরি চক্কোর্তিটা চিরকালের ফাজিল; বল্‌লে—'চণ্ডে ওখানে এতক্ষণ বসে আছে। সে আর কোথাও গেছে! আপনার যেমন কথা—।'

"বলা বাহুল্য, তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে থামিয়ে সকলকে নিয়ে

বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে পাঁচিলের কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম—'চণ্ডী আছ ? চণ্ডী ?'

"চণ্ডীর দাদা ছিলেন, আমার পিছনে। বল্‌লেন—'একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—না ? ঐ শোন—ঐ—।'

"সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। হাঁ—ঐ যে—মনে হচ্ছে সামনের ঘরখানার মধ্যে কে যেন—গোঙাচ্ছে !

"বল্‌লাম—'দাদা, চলুন সকলে।'

"আমি রইলাম সকলের আগে। সকলের আগেই উঠোন পার হয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছলাম। এবার শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌ল। গোঙানির মাঝে মাঝে কে যেন কথা বল্‌ছে—না ?

"চণ্ডীর দাদা বললেন—'হাঁ, তাই ত। চণ্ডীর গলা বলে মনে হচ্ছে। চণ্ডী—চণ্ডে—।'

"কিন্তু সে ডাকের কেউ সাড়া দিলে না, আওয়াজও থামল না। এতে রহস্যটা আরও ঘোর বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। আমারও জেদ চাপল, শেষ দেখতেই হবে।

"আমি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বারান্দাটা পার হয়ে ঘরখানার চৌকাঠের ধারে পৌঁছতেই কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠ্‌ল—'এস—এস—বড় অন্ধকার—ওঃ—ছেড়ে দাও—।'

আমি চীৎকার করে বললাম—'চণ্ডীকে পাওয়া গেছে—সকলে এস—ঐ যে কথা বল্‌ছে—।'

"আমার কথা শুনে সকলে পিছনে এসে দাঁড়াল। আমি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না, কয়েক

পা গিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠ্‌লাম। দেখি, গর্তের ভেতর একটা লম্বা কঙ্কালের,—অন্তত সাত ফুট লম্বা বুকের ওপর চণ্ডী কাৎ হায় পড়ে ভুল বকছে, আর কঙ্কালটা তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। অন্য সকলেও ইতিমধ্যে এসে গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কঙ্কালটার প্রকাণ্ড মাথা, চক্ষুহীন কোটর, বত্রিশপাটি দাঁত, বড় চোয়াল—কিন্তু আর বল্‌তে ইচ্ছা হয় না।

সকলে বলে উঠ্‌ল—"বল, বল, থেম না—তারপর কি হলো?"

শচীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"সেই কঙ্কালের বুক থেকে বহু-কষ্টে চণ্ডীকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা চাঙড়ীপোতায় ফিরে এলাম!"

নারাণ জিজ্ঞাসা করলে—"সেই কাৎলা মাছটা?"

শচীন সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"আমি সেইদিনই দুপুরে কলকাতায় চলে আসি। মনটা বড় খারাপ। রাতের বেলা তেতলার ঘরে দরজা ভেজিয়ে একা বসে চণ্ডীর কথা ভাবছি। জানালার বাইরে নারকেল গাছটা বাতাসে সর সর করছে। হঠাৎ হুস্‌ করে দরজাট খুলে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে চণ্ডী! তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাৎলা মাছ। মাছটা তখনও নড়ছে! নিমেষে বুঝলাম, চণ্ডী আর নেই! চণ্ডীর মূর্তিটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।" বলে শচীন চুপ করলে।

নিস্তব্ধ ঘর; বাইরেও তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সকলে সে দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠ্‌ল—"চণ্ডী—চণ্ডী এসেছে—চণ্ডী!"

চণ্ডী ঘরে ঢুকেই বললে—"শচীদা, তোমাকে খুঁজতে এখানে—"

শচীন ততক্ষণে স্প্রীংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ফরাস থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। চণ্ডীকে আর না এগোতে দিয়ে খপ্ করে একহাতে তার একখানা হাত চেপে ধরে আর একহাতে একজোড়া স্যানণ্ডেল কুড়িয়ে নিয়ে সে চণ্ডীকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে—"শীগগির বেরিয়ে আয়—।"

ক্ষিতীশও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠল—"আরে আমার এক পাটি স্যানডাল্ নিয়ে গেল। এ যে দুটোই বাঁ পায়ের—"

পূর্ণ বল্‌লে—"ব্যস্ত হয়ো না, ও আবার আসবার পথ করে গেল।"

রাস্তা দিয়ে তখন একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি যাচ্ছিল। সকলে শুনতে পেল শচীন চীৎকার করে বল্‌ছে—"এই রোখ—রোখ। বাগবাজার—হাঁ—হাঁ—চালাও জল্‌দি—"

তারপরই গাড়োয়ানের গলার ও চাকার দ্রুত চলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"টি—টি—গড়্—গড়্—গড়্!"

এক টাকা সাড়ে তিন আনার গোলমাল !

'আপ' ও 'ডাউন' ট্রেনে টিকিট বিক্রয় পাওয়া যাচ্ছে, ছাপ্পান্নখানা; কিন্তু মাশুল বাবদ রয়েছে মোট একষট্টি টাকা দশ আনা।

নতুন বদলি হয়ে এসেই গুণোগার! স্টেশনটি আবার এমন যে উশুল করবার যো নেই। পান আর মাছে কি হবে? তা ছাড়া এখন খাবার লোকও ত—

খাতা থেকে মুখ না তুলেই 'ছোটবাবু' শ্রীরঞ্জন চৌধুরী হাঁকলেন—"এই ফত্রিঙ্গা—ফত্রি—উঃ! যেমন মশার ডাক, তেমনই ডাকছে বেটার নাক।"

ছোটবাবুর তামাক খাবার অভ্যাস আছে।

পিছনে তার-ঘরের দরজায় ফত্রিঙ্গা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একে শীতকাল; তার ওপর রাত তখন দুটো। কিছুক্ষণ আগে ডাকগাড়ি 'পাস্' হয়েছে; তারপরের মালগাড়িখানাও বিঘাটি স্টেশন ধরে-ধরে। কাজেই ফত্রিঙ্গা নিশ্চিন্ত।

ছোটবাবু একবার ভাবলেন, নিজেই তামাকটুকু সেজে নেন। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রবল হলো না। আবার খাতায় ঠিক দিতে আরম্ভ করলেন।

"এই ত টিকিটের হিসেব দিব্যি মিলে যাচ্ছে।" সহসা ছোটবাবুর শুষ্ক মুখের ওপর দিয়ে একটু বিষাদের হাসি খেলে গেল। মনে মনে বল্লেন—"তখন কি জানতাম, একদিন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ স্টেশন মাস্টার

হয়ে চন্দনপুর স্টেশনেই বদলি হয়ে আস্‌ব? ওঃ! সে কত বছর আগেকার কথা। তখন এখানে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফরম্, পাকা স্টেশনঘর, ওয়েটিংরুম—কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝখানে একখানা ছোট খড়ের ঘর, তার আলকাতরা মাখানো চাটাইয়ের বেড়া। পিছন-দিকে পাশাপাশি দুটো খাদ জলে ভরা। তাদের মধ্যে কল্‌মি আর হেলঞ্চ বন। পাড়ের ওপর কাশের ঝাড়। খাদের ওপারে রেল বাবুদের কোয়াটারস্;—দুটো খাদের মাঝ দিয়ে সেদিকে যাতায়াতের কাঁচা পথ। তার শেষে একটা বাঁকা নিম গাছ। প্ল্যাটফরমটা ছিল এত নিচু—ট্রেন থেকে নামবার সময় কয়েকবার ত পড়তে পড়তে রয়ে গেছি। সে সব দিন আর নেই! হাঃ—হাঃ—অক্ষয় আর আমি—"

ফত্রিঙ্গা কম্বলটা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে বললে—"কি বলছেন? ইস্‌পিশ্যাল আস্‌ছে?"

শ্রীরঞ্জনবাবুর চমক ভাঙল; বল্‌লেন, "না। একটু তামাক দিবি বাপ?"

শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ির কথা মনে পড়ল।...

স্টেশন থেকে একটা কাঁচা-পাকা সড়ক চলে গেছে সোজা উত্তরে। সড়কটার দুপাশে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল। তার মাঝে মাঝে চারা খেজুর, শিমূল, আম ও বাব্‌লা গাছ নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের মাঝে দুটি খাল, গরুর গাড়ির চাকায় তৈরী হয়েছে। দুপাশে মাঠ, মাঠের শেষে গ্রাম। সড়ক ধরে ক্রোশ দেড়েক ভাঙলেই চন্দনপুরের

বিল। বিলটা শেষ হয়েছে একবারে অক্ষয়দের গ্রাম মালাড়ার পূবে। ঐ মালাড়াতেই ছিল, শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ি।

ফত্রিঙ্গা তামাক এনে বল্‌লে—"নিন বাবু।"

শ্রীরঞ্জনবাবু হুঁকোটা নিয়ে নলচে ধরে একমনে টান্‌তে লাগলেন; তাঁর বাঁ হাতখানা রইল খাতার ওপর। ক্রমে ধোঁয়ায় তাঁর মুখের চারধার ঢেকে গেল।

"অক্ষয়টা—হাঃ—হাঃ—একবার আখ-ক্ষেতে আখ ভাঙতে গিয়ে—কি রে অক্ষয়?—তুই? এই রাতে—? বস্—বস্। সে কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বি?"

শ্রীরঞ্জনবাবু আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করলেন—"কবে এসেছিস?"

"দুটো রাতও কাটেনি। তোর চিঠি পেয়েছিলাম। যা গোলমাল গেল ক'দিন! উত্তর দেওয়া হয়নি। দেখদেখি ভাই, কি গ্রহের ফের! সেই চন্দনপুর স্টেশনেই এলাম ছোটবাবু হয়ে? তারপর কি খবর? কিন্তু এই রাতে তুই—?"

অক্ষয়ের আপাদ-মস্তক ঢাকা, কেবল মুখখানা খোলা। তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটোকে আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে; বললেন—"রঞ্জন, তোর চুল সবই পেকে গেছে—"

"পাক্‌বে না? কত বয়স হলো বল দেখি? তা ছাড়া—কিন্তু তোর চেহারা বেশ আছে। বস্‌ছিস্ না কেন?"

অক্ষয় টেবিলের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে সরে গিয়ে টিকিট বাক্‌সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরঞ্জনবাবুর মনে হলো,

অক্ষয়ের ব্যবহারে আন্তরিকতা নেই, সে যেন একটু দূরে সরে গেছে ; বল্‌লেন—"তামাক খা। ওহো! আমি ভুলেই গেছি, এই বদ্ অভ্যাসটা তুই করিসনি। হ্যাঁরে অক্ষয়! বিলের ধারে বটতলায় সেই পোড়ো মন্দিরটা এখনও আছে ? মাঠের ধারের সেই আমগাছ ক'টা ? আমার মামাদের ভিটে ?"

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে জানালেন—হাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই সপরিবারে এসেছিস্ ?"

"নাঃ। নতুন জায়গা—সব দেশে। আমাদের দেশের কথা তোর মনে পড়ে ?"

"হাঁ। সেই চিঁড়ে, গুড়, নারকোল আর সকলের ওপর কাকীমার যত্ন এখনও ভুলতে পারিনি।"

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ; শ্রীরঞ্জনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বল্‌লেন—"যখন দেশে যাব ওদের আন্‌তে আসবার সময় তোর জন্য চিঁড়ে, গুড়, নারকোল এনে মালাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসবো—"

"কিন্তু আমি ত আর ওখানে নেই।"

"সে কি? কোথায় আছিস্ ? তোর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে—?"

"তারা সকলেই আছে। কেবল আমিই চলে এসেছি—"

"এই বয়সে রাগ করে বিবাগী হয়েছিস ? কার ওপর রাগ—স্ত্রীর না ছেলের ওপর ?"

"কারো ওপরেই আমার রাগ নেই। আর থাকতে পারলাম না।"

"কোথায় যাচ্ছিস্ ? এ কি ছেলেমানুষী ? সে হবে না—টিকিট ত

আমার হাতে। ছাড়ছি না। বাড়ি না যাও, এখানে থাক। হতভাগারা এল বলে তোর খোঁজে। আমি নিজে যাব তোর সঙ্গে—”

অক্ষয় একটু হাস্‌লেন ; তাঁর চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

শ্রীরঞ্জনবাবু বললেন—“কোন গুরু পাক্‌ড়েছ বুঝি ? তিনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন—কা তব কান্তা ?...”

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল—ঠং-ঠং-ঠং। বাইরে কোথায় কাকও ডাক্‌ছে। দূরে রেল-লাইনের ধার থেকে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল—রাত শেষ হয়ে এল।

“দাঁড়া ভাই। কাজটা সারি—ভোরের গাড়ির সময় হলো” বলে ছোটবাবু তাড়াতাড়ি উঠে হাত থেকে হুঁকোটা টেবিলের পায়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে টেলিফোনের কাছে গেলেন। তারপর ফোন ধরে হাঁকলেন—“হ্যাঁ—কি ?—লেট হয়নি ? আসছে ? ওরে ফত্রিঙ্গা—এই ফতে ! গাড়ির ঘণ্টা দে।”

সেখানকার কাজ সেরে টিকিটবাক্‌সের দিকে যেতে যেতে বললেন—“তারপর ? ব্যাপারটা কি খুলে বল্‌ত।” এবং অক্ষয়ের দিকে চোখ তুলে দেখেন, সেখানে অক্ষয় নেই ! এদিকে-ওদিক তাকালেন, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, বাইরে যাবার দরজার কাছে বসে ফত্রিঙ্গা তার বিছানাটা গুটিয়ে নিচ্ছে ! শ্রীরঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাক্‌ল না। ঘরের দুটি দরজা, দুটি জানালাই ত বন্ধ। টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটাও আঁটা।

শ্রীরঞ্জনবাবু ফত্রিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“বাবুটি কোথায় গেলেন দেখেছিস্ ?”

"কৌন্ বাবু ?"

"যে বাবু একটু আগে এসেছিলেন ?"

"কৌনো বাবু ঘরমে ঘুষা নেহি—"

শ্রীরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি তারঘরের মধ্যে গিয়ে ঘরখানা পরীক্ষা করে এলেন। সেখানেও অক্ষয় নেই !

ফত্রিঙ্গা ঘণ্টা দিচ্ছে ; পয়েন্টস্‌ম্যান ফাগু মস্ মস্ করতে করতে এসে সিগ্‌নালের তালার চাবি নিয়ে গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু অন্যমনস্কের মতো টিকিট বাক্সের ডালাটা খুললেন, টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটার ঢাকা সরিয়ে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান দিয়ে একখানা কালো হাত ভেতরে এল, ওপাশ থেকে হাতের মালিক বললে—"বাবু, ষষ্ঠীপুর সাড়ে তিন খানা—"

তারপরই শোনা যেতে লাগ্‌ল টাকা-পয়সার শব্দ, টিকেটে ছাপ দেবার আওয়াজ—ঘটাং—ঘটাং—ঘটাং—

হাতের মালিক বল্‌লে—"বাবু! দুটো পয়সা কম নেন্। গরীব মানুষ !"

"ধ্যৎ ! কৈ হে আর কে আছ ? এই ! সরে যাও ওখান থেকে।"

টিকিট দিতে দিতে শ্রীরঞ্জনবাবু নিজের মনেই বলে উঠলেন—"তখন নিশ্চয়ই আমার তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

স্থির করলেন, অক্ষয়কে তাঁর আগমন-সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেবেন। তবুও তিনি মনে শান্তি পেলেন না।

ক্রমে টিকিট দেওয়া শেষ হলো। ওদিকে তখন পূব দিক ফরসা হয়ে এসেছে। গাড়ির হুইসিল শোনা গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু কম্ফর্টারের ওপর মাথায় কালো গোল টুপি চড়িয়ে কলম

হাতে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ি হোম-সিগন্যাল পার হচ্ছে। ঐ ঝিকমিক করছে ইন্‌জিনের সবুজ আলো।

আবার ঘণ্টা পড়ল। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থাম্‌ল। যাত্রীরা উঠছে, নামছে, ছুটছে, চীৎকার করছে; দরজা বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। চারধারে ব্যস্ততা ও শব্দ। শ্রীরঞ্জনবাবু গার্ডের গাড়ির কাছ থেকে মাথার ওপর হাত নেড়ে হাঁক্‌লেন—"ঘণ্টা—।"

ঘণ্টা পড়ল, গার্ড হুইসিল দিতে দিতে লণ্ঠন দোলাতে লাগ্‌ল, ইন্‌জিন হুইসিল দিয়ে সশব্দে চল্‌তে আরম্ভ করল। শ্রীরঞ্জনবাবু জন দুই যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করে স্টেশন ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এদিকে পূবের আলো ততক্ষণে আকাশ বেয়ে পশ্চিমে পৌঁছেচে, নিচের অন্ধকার গলে পাতলা হয়ে উবে যাচ্ছে; কিছুদূরের মানুষকে বেশ চেনা যায়।

শ্রীরঞ্জনবাবু দেখলেন, একটি যুবক, তার পাশে একটি কিশোরী, তাদের পাশে একজন লোক আসছে। লোকটার মাথায় বিছানা ও ট্রাঙ্ক। তারা সেই ট্রেন থেকেই নেমেছে। তারাও স্টেশন ঘরের দিকে আসছিল। ঘরের গায়েই স্টেশন থেকে বা'র হবার ফটক।

তারা তিনজনে শ্রীরঞ্জনবাবুর কাছাকাছি হতেই তিনি তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। দেখেই বলে উঠলেন—"অক্ষয়ের জামাই না? ঐ ত ওর পাশে কমলা। আর ঐ যে ওদের রাখাল, মধু। নিশ্চয়ই অক্ষয় এসেছে। আমি স্বপ্ন দেখি নি। কিন্তু সে পালাল কেন?" তারপর উঁচু গলায় বল্‌লে—"বাবাজী যে? ভাল ত? মা কমলা!"

অক্ষয়ের জামাতা বাবজী ও মেয়ে কমলাও এবার তাঁর দিকে ভাল করে তাকালে।

জামাতা বাবাজী নমস্কার করে বললে—"আজ্ঞে হাঁ।"

কমলা তাঁর মেয়ে গৌরীর বয়সী। গৌরী নেই! তিনি বললেন—"কেমন আছ মা? তোমার বাবা ত—"

কমলা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখলেন, তার দুচোখে জল টল টল করছে। তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে বলে উঠলেন—"তোর চোখে জল কেন মা?"

জামাতা বাবাজী বল্লে—"জানেন না? সাত দিন হ'ল শ্বশুর মশায় স্বর্গারোহণ করেছেন—"

"কি?"

"সাত দিন হ'ল মারা গেছেন—"

"কিন্তু—আমি যে"—শ্রীরঞ্জনবাবুর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বার হলো না। ক্ষণিকের জন্যে তিনি স্মৃতির মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেল্লেন। সহসা ফত্রিঙ্গার ডাকে ফিরে দেখেন, জামাতা বাবাজীরা তিনজনে গেট পার হয়ে, পথের ধারে একখানা ছই-ওয়ালা গরুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না; স্টেশন ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

সেদিন কোয়টারসে যাবার আগে তিনি সেই এক টাকা সাড়ে তিন আনার হদিস্ পেলেন। কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে নিশীথে সাক্ষাৎ—স্বপ্ন কি সত্য, তার মীমাংসা করতে পারলেন না।

একখানি আলোছবি

অনন্ত মিস্ত্রির বাড়ির সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, আবার বৃষ্টি নামলো।

খড়ের বাড়ি সামনে হাতখানেক চওড়া সরু পথ, দু-পাশে কচুবন। বাড়িখানার ওপর বড় বড় ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গোটা দুই বাক্সবাদাম ও একটি ঘোড়নিমের গাছ। সেখান থেকে কিছু তফাতে ছিল একটা ভাঙা ইটের পাঁজা; তার পাশে পড়েছিল একখানা ভাঙা লরি। চারধার থেকে কেমন একটা পচা, ভাপসা, বুনো গন্ধ উঠছিল।

বৃষ্টিতে না ভিজলেও মিস্ত্রির বাড়িতে আসতে গিয়ে পথের দু'পাশের কচুবনের জলে জামা কাপড় ও জুতো গিয়েছিল ভিজে।

ঘরের ছেঁচতলায় যথাসাধ্য জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "মিস্ত্রি— মিস্ত্রি বাড়ি আছ?"

সূক্ষ্মধারায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, বাদলার দমকা বাতাসে গাছক'টা সরসর, ঝরঝর করে দুলে উঠলো। তাই আরও জোরে ডাকলাম, "অনন্ত মিস্ত্রি বাড়ি আছ?"

তবুও সাড়া পাওয়া গেল না। সন্দেহ হলো, বাড়ি ভুল হয় নি?

কিন্তু লোকটি আমায় এই বাড়িই দেখিয়ে দিয়েছিল। এদিকে আর কোন বাড়িও দেখছি না। বলেছিল, 'ঐ পাঁজাটার ধারে—।' ওই ত পাঁজা!

সম্ভবতঃ মিস্ত্রি ঘুমোচ্চে। রবিবার—ছুটির দিন। মিস্ত্রি খেয়ে-দেয়ে দুপুরে ঘুমোচ্চে। দিনটাও ঘুমোবরই মতো। ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি, ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস, শ্রাবণ-মেঘের তরল কালো ছায়া, পথে পথিক নেই, দু-একখানি গাড়ি মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ছুটে চলেচে। এখন মনে হয়, গায়ে একখানি পুরু চাদর ঢাকা দিয়ে, একখানি সুন্দর গল্পের বই পড়তে পড়তে চোখে তন্দ্রা নেমে আসুক।

এবার ঘরের কবাটে একটু ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, "মিস্ত্রি—ও মিস্ত্রি—"

খট্ করে খিল্ খুলে গেল ; দরজাটি একটু ফাঁক করে একখানি ছোট কালো মুখ বললে, "বাবা বাড়ি নেই ?"

"বাড়ি নেই ?"

দরজাটির ফাঁক একটু ছোট হয়ে গেল। এবার বেশি করে দেখা যেতে লাগলো তার চোখ দুটির কৌতূহলভরা বন্য দৃষ্টি। বললে, "না।"

"কোথায় গেচে ? কখন ফিরবে ?"

"জানি নে—"

হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। তরল অন্ধকারটা বেশ ঘন হয়ে উঠলো। বাতাসের পাগলামী বাড়লো। ছাতায় এই জল, এই ঝাপটা আটকাবে না। সঙ্গে ক্যামেরা। বর্ষাশ্রী তুলতে শহরতলীর দিকে এসেচি। ইচ্ছা, পথে অনন্ত মিস্ত্রিকে আমার রেডিওর খোলটার জন্যে একটু তাগিদ দিয়ে যাবো। লোকটা আমাদেরই পাড়ার এক কার-খানায় মাঝে মাঝে কাজ করতে যায়। কিন্তু এই জলে দামী ক্যামেরা ও হাতঘড়িটা ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।

বললাম, "খোকা, আমাকে একটু বসতে হবে। দরজাটা খোল—"

কিন্তু সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ একটা ঝাপ্টা এসে গায়ে লাগতেই তাকে একরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়লাম। সে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

ঘরে জানালা বা আর কোন দরজা আছে কিনা, মানুষজন আর কে কোথায় আছে, সাজ-সজ্জা কেমন দেখবার আগেই একটা উৎকট জটিল গন্ধ এসে নাকে লাগলো। কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই। যতক্ষণ বৃষ্টির বেগ থাকবে ততক্ষণ সেখানে থাকতেই হবে।

হঠাৎ একটি কচি ছেলের কান্না কানে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে তাকালাম। আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না ; কয়েকটা কাঠের বাক্স, তক্তা ও কানেস্তারার ওধার থেকে কান্নাটা এসেছিল। সেগুলোর পাশে চাটাইয়ের বেড়ায় একখানা ছেঁড়া ময়লা শাড়ি ও দড়ির টানায় খান কয়েক ছেঁড়া কাঁথা শুকোবার আশায় ঝুলচে।

জলের ঝাপ্টা এসে ঘরে ঢুকছিল। কিন্তু গন্ধের ভয়ে দরজাটা বন্ধ করলাম না, একপাশে একটা কেরোসিনের বাক্স পড়ে ছিল, সেটা টেনে নিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসে দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করে দিলাম।

ছেলেটি হঠাৎ কার ডাকে যেন সাড়া দিয়ে কাঠের বাক্সগুলোর ওধারে চলে গেল। তার একটু পরেই ফিরে এসে বললে, "বাবা বাড়ি নেই। বাবাকে কি বলতে হবে বলুন। বাবা এলে বলবো—"

স্বর একটু উঁচু করেই বললাম, "তোমার বাবাকে একটা রেডিওর বাক্স তৈরি করতে দিয়েচি। তোমার বাবা বলেছিল, 'বাড়ি থেকে তৈরি

করে এনে দেবো।' পরশু দেবার কথা। তোমার বাবা কোথায় বসে কাজ করে? এখানে তো তার চিহ্ন পর্যন্ত দেখচি না। তোমার বাবাকে কোন বাক্স-টাক্স তৈরি করতে দেখেচো? সে আমার কাছ থেকে আগামও নিয়েচে—"

ছেলেটি বললে, "বলতে পারি না।"

"বলবার কথা তোমার নয়। আর আমার কথা ফুরোলেও তোমাদের ঘর ছেড়ে এখন যেতে পারচি না। দেখচো তো বৃষ্টির তোড়? একটু ধরলে যাবো—"

হঠাৎ টপ্-টপ্ করে পিঠে জল পড়লো। তাকিয়ে দেখি, চাল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়চে। সরে বসলাম। ছেলেটি ছুটে গিয়ে খান চারেক মাটির গামলা ও সরা এনে ঘরের মেঝের চার জায়গায় পেতে দিলে। আবার আমার মাথায় জল পড়লো। এবার আর না সরে ছাতাটি খুলে বসলাম।

ছেলেটি এসে আমার পাশে উবু হয়ে বসলো। তার বন্য দৃষ্টি আটকে রইলো আমার ক্যামেরা-কেসে। সোনার হাতঘড়িটা সে বার দুই দেখলে, কিন্তু তার যত কৌতূহল সব কেন্দ্রীভূত হলো আমার ক্যামেরাটিতে। আমিও এবার তাকে বেশ ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু বৈশিষ্ট্য কোথাও খুঁজে পেলাম না। চুল, নাক, মুখ, কপাল, ছেঁড়া খাঁকির হাফপ্যাণ্ট, অপুষ্ট দেহ—এ তো পথে-ঘাটে, ঘরে সাধারণ ও স্বাভাবিক দৃশ্য।

আমার চোখ গিয়ে পড়লো বেড়ার গায়ে একটি ছোট কাঠের ব্রাকেটে। তাতে রয়েচে একখানি শ্লেট, খান চারেক বই ও কয়েকটি খাতা।

জিগ্যেস করলাম, "ঐ বই-শ্লেট কার ?"

সে ঘাড় না ফিরিয়েই বললে, "আমার।"

মিস্ত্রির ছেলে পড়ে !....

"কোথায় পড় ?"

"কর্পোরেশনের স্কুলে।"

"কোন্ ক্লাসে ?"

"থ্রিতে—"

পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলাম। একটি সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে, কেসটা পকেটে আবার রেখে দেশলাই বার করে দেখি একটিও কাঠি নেই।

জিগ্যেস করলাম, "তোমার নাম কি ?"

"বিশ্বনাথ।"

"বিশ্বনাথ, একটা দেশলাই আনতে পারো ?"

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"কি—পারবে না ?"

"দেশলাই কোথায় জানি না।"

"উনুনে আগুন নেই ?"

সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানালে, 'না।"

বললাম, "দেখ তো অনেক সময় ছাইয়ের তলায় আগুন থাকে।"

সে তবুও দাঁড়িয়ে রইলো।

বললাম, "তুমি দেখেই এসো না।"

সে আস্তে আস্তে বললে, "আজ রান্না হয় নি।"

"কি ?...কি বলচো ?"

সে কোন উত্তর দিলে না।

এমন সময় একখানি মানপাতা মাথায় দিয়ে ভিজতে ভিজতে এলো এক বুড়ী। সে আমাকে দেখে প্রথমটা চমকে গেল, তারপর সামলে নিয়ে বললে, "অনন্তকে দরকার ? সে তো তাগাদায় বেরিয়েচে সেই সকালে। কি কাজ আছে ?"

"তুমি তার কে ?"

"সে আমার ছেলে। তার কাছে কি দরকার ?" বলে বুড়ী পেট-কাপড় থেকে একটি ছোট পুঁটুলি বার করলে। মনে হলো চালের।

বললাম, "যা দরকার তা তোমার নাতিকেই বলেচি। বৃষ্টির জন্যেই আমি একটু বসেচি তোমাদের ঘরে।"

"বসুন ! কিন্তু এ তো আপনাদের যোগ্য ঘর নয়।" বলে বুড়ী ভেতর দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেল।

একটু পরেই ঘরে ছড়িয়ে গেল ধোঁয়া। বিশ্বনাথ একটি কাঠিতে আগুন ধরিয়ে আমার সামনে নিয়ে এলো।

কিন্তু সিগারেট ধরাতে আর আমার তত উৎসাহ ছিল না, তবুও ধরালাম। তার মুখখানির দিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। কতকালের বুভুক্ষা ও দৈন্য রয়েচে ওখানে !

তারপর—

বৃষ্টির বেগ কমে এলো, মেঘ পাতলা হয়ে গেল, কিছু আলো ফুটলো।

এমন সময় জলসিক্ত হয়ে অনন্ত ঢুকলো ঘরে।

সে আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে গেল, বললে, "বাবু—আপনি ?"

বললাম, "এদিকে এসেছিলাম। তাই তোমার বাড়িটা দেখে গেলাম। এসে শুনি তুমি নেই। ফিরে যেতে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা পড়েচি···কিন্তু তুমি যে কাঁপচো। শীগগীর ভিজে কাপড় ছাড়—"

সে তেমনি দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার সেই অর্ডারটা আমি এ ক'দিন ধরতে পারি নি। আমার বউটা সেদিন রাস্তার কল থেকে জল আনতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। গরিব মানুষ, ডাক্তার-কবরেজের পেছনেই সব খরচ করলাম। বউটা পড়ে। বুড়ী মা। ঘরে আজ চালও ছিল না। তাগাদায় গিয়েছিলাম এক জায়গায়—"

"পেলে কিছু ?"

"বাবু বরাত মন্দ! কাজও পাওয়া যায় না—টাকাও আদায় হয় না। আপনার কাজটা বাবু—"

"সে ভাবতে হবে না তোমায়। কাল আমার সঙ্গে দেখা করো।"

তখন বৃষ্টি প্রায় থেমে গেল।

বললাম, "এস বিশ্বনাথ, তোমার একখানি ছবি তুলি।"

সে প্রথমটা আপত্তি করলো, কিন্তু তাকে এক রকম জোর করে টেনেই দরজার কাছে আলোয় দাঁড় করিয়ে দিলাম; ক্যামেরা খুলে ছবিও তুললাম।

কিন্তু এই ভাঙা খড়ের ঘরে কানেস্তারা ও কেরোসিনের বাক্সর সামনে একটা কালো, রুক্ষ কর্কশ চুল, ম্লান মুখ, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা,

পেট মোটা, পাঁজরা-বার-করা বারো-তেরো বছরে ছেলে কি গল্প, হাতে আঁকা ছবি বা আলো-ছবির যোগ্য বিষয়বস্তু ?

ওস্তাদরা বলেন, "এ সবের জন্যে ভাল বিষয়বস্তু চাই। সাধারণ যা তা এ সবের বিষয়বস্তু হতে পারে না।" জানি না পাঠক-পাঠিকাদের কি মত !

তবুও আমি তুলেচি। 'ওয়াশ' করে দেখবো কেমন দাঁড়ায় এবং তারপর ছাপবারও আগ্রহ আছে।

কাগজের বাক্সর কারিগর

মণি কাগজের বাক্স থেকে তার জুতোজোড়াটি টেনে বার করলে। যেমন চামড়া তার তেমনি রঙ, আর সেই রকম কাট্। পায়ে দিয়ে মনেই হয় না যে পায়ে জুতো আছে। তাই দামও নিয়েছে সেল ট্যাক্স্ সমেৎ আঠারো টাকা। জুতোজোড়া পুজোর। এই জোড়া নিয়ে তার জুতো হল চার জোড়া।

সে জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে পরিষ্কার মেজের ওপর একটু ঘুরে ধুলো ঝেড়ে আবার বাক্সে পুরে রাখলে। এমন সুন্দর জুতো, কিন্তু এর বাক্সটা তেমন ভালো নয়। তবে নিতান্ত খারাপও বলা চলে না।

অাচ্ছা, জুতোওয়ালারা সাবান, স্নো, এসেন্সের মতো জুতোর বাক্সও সুদৃশ্য করে তৈরি করে না কেন? এই বাক্সটা—সে জুতো-জোড়াটা আবার বাক্স থেকে খুলে টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে খালি বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো! বাক্সটার দুপাশে লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম ও জুতোর সাইজ। সাইজটা লেখা আছে হাতের লেখায়। লেখা দেখে মনে হয়, যে লিখেছে সে লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি। ভেতরে—? এই ছাপটা কিসের? মনে হচ্ছে যেন লাল কালির। রঙও হতে পারে। আবার রক্তের দাগও যে হতে না পারে তাও নয়। কিন্তু রক্ত কি করে লাগবে? আর কারই বা রক্ত হতে পারে? তবে সে তা নিয়ে আর মাথা ঘামালো না।

বেলা তখন পাঁচটা। সে জুতোজোড়া বাক্সে তুলে রেখে মাঠে খেলতে চলে গেল।

তারপর—

খেলে যখন বাড়ি ফিরছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। সে আসছে একা। বগলে ফুটবল, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে ডোরাদার জারসি, পায়ে স্পোর্টিং বুট। তার সামনে বিপরীত দিক থেকে আসছে তারই সমবয়সী বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা ছিটের ইজের, গায়ে ছেঁড়া জামা, পায়ে ছেঁড়া ব্রাউন কেডস্, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দুজনে সামনা-সামনি হতেই ছেলেটি একটু সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, আনন্দে বলে উঠলো. "কি মণি!"

মণি প্রথমটা, ক্ষণিকের জন্যে, তাকে চিনতে পারলে না। তারপরই মনে পড়লো। সে ছিল তাদেরই পড়শী, তার এক খেলার সাথী। তবে সে বছর দুই আগের কাহিনী। মণি বললে, "বুলু?"

—"হাঁ। কেমন আছ?"

—"ভাল! তোমার হাতে কি হয়েছে?" দু' বছর আগে তারা পরস্পরকে বলতো, 'তুই'।

বুলু বললে, "কেটে গেছে।"

—"কি করে?"

—"কারখানায় কাজ করতে করতে।"

—"কোন্ কারখানায়?"

—"কাগজের বাক্সর কারখানায়। আমি সেখানে বাক্স তৈরি করি। কত রকমের বাক্স—জুতোর, গেঞ্জির, চিঠির খামের।"

—"তুমি পড় না?"

—"না।" বলে বুলু ম্লান হাসি হাসলে। তারপর আবার বললে, "আমার ছোট ভাই মন্টুও সেখানে কাজ করে। সে মাইনে পায় সাত টাকা, আমি পাই বারো টাকা।"

বুলুরা থাকতো মণিদের পাড়ার শেষে মাটকোঠা বস্তির দুখানা ঘর নিয়ে। ওর বাবা কোন্ একটা দোকানে চাকরি করেন। ওর মা প্রায়ই আসতেন মণির মায়ের কাছে। মা লোকের সঙ্গে গল্প করতে এত ভালবাসেন! দুজনে কত গল্প হতো। মা তাঁকে এটা-ওটা দিতেনও।

বাড়িওলা ভাড়ার জন্যে শেষে একদিন গুণ্ডা এনে ওদের বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

বুলু বললে, "মাসীমা ভাল আছেন?"

—"হুঁ"

—"তুমি খেলতে গিয়েছিলে? যাই বাড়ি।"

—"এখন কোথায় থাক?"

—"মানিকতলায়।"

—"কোন্‌খানে?"

বুলু প্রথমটা বলতে চাইলে না। শেষে বললে। জায়গাটা খালের ধারে একটা পাঁচমিশেলী বস্তি।

মণি বললে, "তুমি কি রোজ এ পথ দিয়ে যাও?"

—"না। এদিকে আমাদের কারখানার এক সাথী থাকে। ছুটির পর তার সঙ্গে তাদের বাড়িতে এসেছিলাম।"

মণির তাকে নিজের বাড়িতে ডাকতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো। মনে হলো, সে যেন বুলুর কাছে অপরাধী! বুলু যেন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

বুলু আবার বললে, "চললুম।"

—"আচ্ছা" বলে মণিই আগে ঘাড় নিচু করে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

বাড়ি এসে বলটা পড়বার ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে অন্ধকারেই সে চেয়ারে চুপ করে বসে রইলো। তার সামনে টেবিলের ওপর কাগজের বাক্সে নতুন জুতোজোড়াটি। সে ভাবলে, বুলু মাইনে পায় বারো টাকা। জুতোজোড়াটার দাম আঠারো টাকা। কে জানে বাক্সটাতে হয়তো লেগে আছে বুলুরই হাতের রক্ত এবং হয়তো ওটা এসেছে ওদেরই কারখানা থেকে!

সে জুতোশুদ্ধ বাক্সটা টেবিলের নিচে ধপ করে ফেলে পাশের ঘরে তার বাবার কাছে গেল। তিনি তখন বেড়াতে যাবার আয়োজন করছেন।

মণি বললে, "বাবা, ছেলেরা লেখাপড়া না শিখে কাগজের বাক্সর কারখানায় কাজ করে কেন?"

তার বাবা এ প্রশ্নে বিস্মিত হলেন; তবুও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "গরিব বলে।"

—"ছোট ছেলেদের তো লেখাপড়া শেখা উচিত!"

—"হুঁ।"

—"তবে ওরা লেখাপড়া শেখে না কেন?"

—"গরিব বলে।"

—"ওরা কেন গরিব?"

তার বাবার দৃষ্টি যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো; বললেন, "ওসব বাজে কথা রেখে এখন পড় গে। ওই তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন। কি? এখনও খেলার পোশাক ছাড় নি? যাও—যাও—"

—"কিন্তু ওরা গরীব কেন?"

—"যাও বলছি!"

মণি ক্ষুণ্ণমনে চলে গেল এবং পোশাক বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে মাস্টারমশাইকে প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলো, "আচ্ছা মাস্টার-মশাই, কাগজের বাক্সর কারখানায় যে সব ছেলে কাজ করে তারা গরিব বলেই পড়াশুনো না করে কাজ করে তো?"

—"তাই বটে।"

—"ওরা কেন গরিব?"

—"সকলেই কি আর বড়লোক হতে পারে?"

—"কেন পারে না?"

—"সকলের বুদ্ধি তো সমান নয়। যার বুদ্ধি বেশি সে-ই বড়লোক হয়।"

—"আচ্ছা, যে খুব ভাল অঙ্ক জানে সে খুব বুদ্ধিমান?"

—"হুঁ।"

—"তা'হলে আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই গরীব কেন? তিনি তো ছেঁড়া জামা-কাপড়, তালি-দেওয়া জুতো পরে আসেন।"

মণির গৃহশিক্ষকটিও একটি বড় সওদাগরি আফিসের একটি শাখার হিসাব-নবিশ। প্রশ্নটির তিনি জবাব দিতে পারলেন না। তার ওপর সেদিন তাঁর বাড়ি থেকে টাকার অভাব জানিয়ে একখানি লম্বা চিঠি এসেছিল! তাই মন ভাল ছিল না; বললেন, "তুমি এখন পড় দেখি! তোমার ওসব বাজে ভাবনা কেন?"

কিন্তু সেই বাজে ভাবনাটাই মণির মাথায় প্রধান হয়ে ঘুরতে লাগলো। তার মনের চোখে ভাসতে লাগলো বুলুর ম্লান মূর্তিটি, কানে বাজতে লাগলো তার কথাগুলি, মনে পড়তে লাগলো তার জুতোর দাম ও বুলুর মাহিনার কথা। মাস্টারমশাইয়েরও পড়ানোয় উৎসাহের অভাব ঘটলো। তাই গুরু-শিষ্য পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে সকাল সকাল কর্তব্য শেষ করলেন।

মণি এলো মায়ের কাছে; বললে, "মা, বুলুর সঙ্গে আজ পথে দেখা হয়েছিল।"

—"কে বুলু? ও! সেই! ওরা কোথায় আছে?"

—"মানিকতলায়। ওরা দু-ভাই একটা কাগজের বাক্সর কারখানায় কাজ করে! আচ্ছা মা, তুমি যে ওদের এক সময়ে কাপড়-জামা দিতে এখন আর দাও না কেন?"

—"ওরা তো আর আসে না। তা ছাড়া জামা-কাপড় এখন তো আগেকার মতো পাওয়া সহজ নয়, দামও বেশি।"

—"কিন্তু আমাদের কোন কিছুর তো অভাব নেই। বরং বেশিই আছে।"

—"ওসব তোমার বাবাকে কত কষ্টে জোগাড় করে আনতে হয় তা তো জানো না।"

—"মা, আমার একটা শার্ট, একটা গেঞ্জি, একটা প্যাণ্ট আর ওই নতুন জুতোজোড়াটা বুলুকে দেবো? এই তো সেদিন এক জোড়া জুতো কিনেছি। আমার তো অভাব নেই—"

—"ওমা! ওসবের দাম কত!"

—"বেশ! তবে আমিও পরবো না।"

—"সে কি? তা'হলে তোমার বাবা বকবেন!"

—"যার নেই তাকে দিয়েছি শুনলে কিছুই বলবেন না।"

তারপর দু'জনে বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চললো। পরিশেষে মা সম্মতি দিলেন।

ঘটনাক্রমে পরদিন ছিল রবিবার। সেদিন কারখানারও ছুটি। মণি জিনিষগুলো খবরের কাগজে মুড়ে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে দুপুরের দিকে একাই রওনা হলো বুলুদের বাড়ি এবং ঠিকানা খুঁজে নিয়ে বুলুদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। বুলু বাড়িতেই ছিল। তার ছোট ভাই মানু গিয়েছিল সাথীদের সঙ্গে খালপারে কোন্ এক জলায় মাছ ধরতে। বাবা গিয়েছিলেন দোকানে।

তার মা তখন বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছিলেন; বোন দুটি

ডাকের সাজ তৈরি করছিল। পূজো আসছে। কাজগুলো ব্যাপারিরা তাদের দিয়ে গেছে ফুরণে।

মণি গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালো! সে বাড়িতে ছিল আরও কয়েক ঘর ভাড়াটে। তবে তারা ঘরে তালা বন্ধ করে তখন কোথায় যেন গেছে। তাকে দেখে বুলুর মা প্রথমটা চিনতে পারলেন না। তাঁর বিশ্বাসই হলো না যে, অত পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে বস্তিতে তাঁদের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে পারে। শেষে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে, সস্নেহে এবং সম্ভ্রমে বললেন, "এস এস, মণি। এতদিন পরে গরিবদের মনে পড়লো ?"

বুলু ঘরে শুয়েছিল। সাড়া পেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো; বললে, "বোস—বোস।"

মণি বসলো বটে, কিন্তু বাড়িখানার গন্ধে ও দৃশ্যে তার গা ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগলো। এখানে লোকে থাকে কি করে ?

বুলুর মা মণিদের কুশলবার্তা জিগ্যেস করবার পর বললেন, "এদিকে কি মনে করে এলে ?"

মণি কোলের কাগজের পোঁটলাটার দড়ির বাঁধন খুলে জিনিষগুলো আস্তে আস্তে বার করে বললে, "এগুলো বুলুর জন্যে এনেছি।"

মা জিগ্যেস করলেন, "কে পাঠিয়েছেন ? মা বুঝি ?"

মণি ঘাড় নাড়লে,—না। বললে, "আমি নিজেই নিয়ে এনেছি।"

বুলু বললে, "আমি নেবো না।"

মণি বললে, "কেন ?"

—"আমি চাকরি করি। লোকের দান নেবো কেন ?"

—“আমি তোমার বন্ধু।”

—“আমি কাগজের বাক্সর কারখানার কারিগর। তুমি বড়লোকের ছেলে, স্কুলের ছাত্র। কি করে আমার বন্ধু হবে ?”

মা বললেন, “ঝগড়া করছিস্ কেন ? এনেছে জিনিষগুলো, নে। এতদিন তো ওদেরই দেওয়া জামা-কাপড় পরেছিস্।”

—“তখনকার কথা ছেড়ে দাও মা। তখন বুঝতাম না। এসব আর আমি নেবো না।”

মণি দেখলো বুলুর মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে।

মা বললেন, “তুমি ওগুলো আমার হাতে—”

বুলু বলে উঠলো, “মা—!”

মা ছেলের মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে সংযত হলেন। মণি জিনিষগুলো হাতে নিয়ে ক্ষুণ্ণমনে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে, ম্লান মুখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তারা দুই বন্ধু বটে, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে উঠেছে একটা কারখানার ব্যবধান।

তারপর—আর কিছু নেই। তবে শুনেছি—মণি এতদূর দুঃখিত হয়েছিল যে, সেবার সে পূজোয় নতুন পোশাক ছোঁয়ই নি। এবারও তো পূজো আসছে!

শূন্য মাঠের কান্না

ঠ্যাঙাড়ের মাঠের ধারে পৌঁছতেই সন্ধ্যা হলো। সামনে কয়েকটা ঝাউ গাছ। বাদলার বাতাসে সোঁ সোঁ করচে, যেন প্রেতিনী কাঁদচে।

মহেশ ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে, আকাশ মেঘে মেঘে কালি। এখনই হয়তো আবার বৃষ্টি নামবে। সে পা চালিয়ে চল্‌লো। কিন্তু পথে জল-কাদা, পা বসে যায়। কাল তো ঐ ঘাসে ঢাকা ঢিপিটার ওপর একটা গোখরো সাফ ফণা তুলে শুয়েছিল।

ঢিপিটা সে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল।

গ্রামে থাকতে বাদল-সন্ধ্যায় মাঠ কি জঙ্গল পার হতে তার একটুও ভয় করতো না কিন্তু এখানে নতুন জায়গায় · ঐ—যে ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে আলো দেখা যায়। আলোটা তাদের বসতির। ভয় তার অনেক কমে গেল। পেটের কাছে বাঁধা টিনের বাক্সটি সে মাথায় তুলে নিলে। সে রেললাইনের ওপারে শহরে গিয়েছিল ফেরি করতে চাল-ছোলা ও মটর ভাজা। অভ্যাস নেই, পেটে চাপ লাগছে। পেটটা একটু জিরিয়ে না নিলে আর পারে না। বেরিয়েছিল বেলা একটায়। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বাদলার সন্ধ্যাতেই এ সব বিক্রি হয় বেশি। কিন্তু এ ক'দিন সন্ধ্যায় থাকতে পারচে না। ঘরে বাবা জ্বরে বেহুঁসের মতো, মাথা-মুণ্ডু কি বকে !

বসতির ত্রিসীমানায় ডাক্তার-কবিরাজ নেই। আছে কেবল মাঠ, জঙ্গল, জলা। তার ওধারে গ্রাম। ডাক্তার থাকলেও তারা ফি আর ওষুধের দাম দিতে পারতো না !

সে ঝাউগাছগুলোর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতেই একটা ছায়ামূর্তি তার পথ আগলে দাঁড়ালো। আর মাঠের ধার থেকে কয়েকটা শিয়াল ডেকে উঠলো। মহেশর বুক ছাঁৎ করে উঠলো—ভূত!

মূর্তিটা ভাঙা গলায় বললে, "কোথা যাবি ?"

মহেশ ঢোক গিলে শুক্‌নো গলায় কোনো রকমে বললে, "অ—ই বসতি"—

"তোর সঙ্গে কি আছে ?"

"চাল-ছোলা মটর—"

"টাকাকড়ি কি আছে ?" বলে লোকটা হাতের মোটা লাঠিখানা দিয়ে একটা খোঁচা দিলে।

মহেশ বললে, "চার টাকা দশ পয়সা—"

"ট্যাকে গুঁজেচিস্ ?"

"না—বাক্সে—"

মূর্তিটা লাঠি দিয়ে বাক্সে একটা ঘা বসিয়ে বললে, "শূয়োরের বাচ্চারা এদিকে এসে আমাদের অন্ন মেরেচে। দে—"

এমন সময় কয়েকটি লোকের গলার আওয়াজ শোনা গেল। কারা যেন্ কথা কইতে কইতে সেদিকে আসচে। বোধ হয় বসতির লোক। মহেশের মাথা থেকে বাক্সটা তুলে নিয়ে মূর্তিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভূত নয় ঠ্যাঙাড়ে! মহেশ কোন রকমে চীৎকার করে উঠলো। তার গলার আওয়াজটাকে ঠিক মানুষের মনে হলো না।

লোকগুলো ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেচে। মহেশ এবার

চীৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে গেল। তারাও এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো।

উভয়পক্ষ পরস্পরের নিকটবর্তী হলে মহেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লে, "আমার সব ডাকাতে কেড়ে নিয়েচে!"

লোকগুলো বলে উঠলো, "ডাকাত! কত ছিল? যাবে কোথায়?"

"ঐ বসতি—"

"বসতি? কার ছেলে তুমি? কোন জেলার লোক?"

মহেশ তাদের চিন্‌তে পারলে। তারাও বসতিতে থাকে। তাদের একজন বলে উঠলো, "ও! তুমি সতীশবাবুর বেটা? পাতপুরের সতীশ রায়—

"হাঁ"—বল্‌তে বল্‌তে মহেশ কেঁদে ফেল্‌লো।

"কত ছিল?"

"চার টাকা দশ পয়সা। বাক্সতে ছিল। চাল-ছোলা-মটর—"

"আর কেঁদে কি করবে? প্রাণে বেঁচেছো এই ঢের।"

"তোমার কি ফেরি করবার কথা? কেঁদো না, চল—"

মহেশ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার সম্বল কেড়ে নিয়ে গেল!

একজন বল্‌লে, "কত বড় সম্পত্তি ফেলে এসে তোমার বাপ এই জঙ্গলে বেদের মতো ছাউনি গেড়েচে। তারও বুঝি প্রাণ বাঁচে না—"

মহেশ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "কাল চাল কিনবো কি দিয়ে? আর বাক্স কিনবারও তো পয়সা জুট্‌বে না!"

"হায় ঈশ্বর! বুঝলে রাজেন্দ্র, এক এক সময় মনে হয়, চুরি-ডাকাতি করি। চল, লক্ষ্মী সোনা—"

মহেশ তাদের সঙ্গে চলতে লাগলো।

রাজেন্দ্র বললে, "কি অন্ধকার! কোথাও কূলকিনারা দেখা যায় না।"

তখন মেঘের ছায়া আরও গাঢ় হয়ে এসেচে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল ঝাউগাছগুলোর মাথা বাদলার দমকা বাতাসে এদিক-ওদিক দুলচে আর শব্দ উঠ্‌চে সোঁ—সোঁ—সোঁ—ও—

ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি নামলো।

চারজনে রাস্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে ছপ ছপ করে জল ভাঙতে ভাঙতে চলেচে।

বসতির কাছাকাছি গিয়ে রাজেন্দ্র বললে, "মহিম খুড়ো! কে যেন কাঁদে?"

"কৈ?"

"ওই শোন—"

চারজনেই কান পেতে রইলো।

"হাঁ—হাঁ—তাই তো—"

বৃষ্টি ও বাতাসের সন্ সন্, ভেকের ডাক ও ঝিঁঝিঁর বুকফাটা চীৎকার এক সঙ্গে মিশে গেচে, আর তারই কোলে একটি স্ত্রীলোকের খুব করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে—উ—উ—উ—

চারজনে নীরবে বসতিতে গিয়ে ঢুক্‌লো। তখন বসতির একখানি বাড়ি থেকেও একটি স্ত্রীলোকের কান্না শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে মাঠের কান্নার মতো নয়।

মহেশ প্রায় টল্‌তে টল্‌তে তাদের কুম্‌ড়ো মাচারতলা দিয়ে চালার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। ঐ হ্যারিকেনটি জেলে তার বাবার মাথার

কাছে মা বসে। বেড়ার গায়ে তার ছায়া স্থির হয়ে আছে। কান্নাটা আস্‌চে পাশের চালা থেকে। মহেশের বুকের ভার গেল নেমে। কিন্তু তার—

মহেশের মা দরজার দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো; "কে রে! মহেশ নাকি?"

"হাঁ—"

"আজ দুপুরে জয়ন্তী মারা গেচে—"

"জয়ন্তী!" বল্‌তে বল্‌তে মহেশ দরজাতেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার বাবা কেমন আছে জিগ্যেস করতেও ভুলে গেল। মন ঘুরে বেড়াতে লাগলো, ঝাউতলার অন্ধকার পথে।

মা জিগ্যেস করলে, "ওখানে বসলি যে? তোর বাক্স কৈ? বার্লি আর লেবু এনেছিস্?"

মহেশ আস্তে আস্তে বললে, "বাক্সটা পথে ডাকাতে কেড়ে নিয়েচে। তার মধ্যে টাকা-পয়সা ছিল। বার্লি আর দুটো লেবুও ছিল—"

"অ্যাঃ!" তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, "ভগবানের মার!"

"ভগবান!"

মহেশের মা গলার স্বরে চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। আলোটি পড়ে ছিল মহেশের ডাগর চোখ দুটির ঠিক ওপরে।

বাইরে তখন সমানে বৃষ্টি ঝরছিল; পাশের চালা থেকে জয়ন্তীর মার কান্নার শব্দ সমানে আসছিল। এবার মহেশের মনে হলো, ওটা সেই শূন্য মাঠের কান্না!

রুপোর পেয়ালা

সন্ধ্যাবেলা। বিজয়কেতু পড়ছে!

তার সামনে টেবিলে আবলুষ কাঠের খুরোর বসানো রয়েছে রুপোর পেয়ালাটি। তার মসৃণ, পালিশ করা সাদা গায়ে বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলো পড়ে ঝিক্ ঝিক্ করছে। বিজয়কেতু পড়ছে আর পেয়ালাটিকে মাঝে মাঝে দেখছে। এক একবার উঠে দাঁড়িয়ে যখন সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখন পেয়ালাটার গায়ে ফুটে উঠেছে তার মুখের প্রতিবিম্ব কিছু বিকৃত হয়ে। পেয়ালাটির ভিতরটা উজ্জ্বল সোনালিতে গিল্টি করা। আলোয় সোনার মতো ঝিলিক দিচ্ছে যেন আনন্দ উপছে পড়ছে।

পেয়ালাটি সে পুরস্কার পেয়েছে পাঁচদিন আগে শারীরিক কসরৎ প্রতিযোগিতায়। তার মতো কসরৎ কেউ দেখাতে পারেনি। সমবয়সী বিশটি ছেলের মধ্যে, পাঁচখানি পল্লীতে সে হয়েছে প্রথম। গতকাল একখানি বাংলা দৈনিক বেরিয়েছে তার ছবি—সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রুপোর পেয়ালাটি।

সে কতজনকে পেয়ালাটি দেখিয়েছে। দেখে কতজন তার পিঠ চাপড়ে তাকে তারিফ করেছে, উৎসাহ দিয়েছে। পেয়ালাটিতে তাই কাউকেই সে হাত দিতে দেয় না। যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ সেটিকে আগলে রাখে। সে বীর! তার চোখ-মুখ থেকে গর্ব ও আনন্দ ছাপিয়ে পড়ছে।

পরদিন—

তিন দিন বাদলার পর দুপুর থেকে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ ঝরে পড়ছে। তার ছোঁয়া লেগে সব ঝলমল ঝিকিমিক টলটল করে উঠছে। পথে পথিক ও যানবাহনের মেলা। তারা চলেছে যেন আলোকের আনন্দে।

পথের এক জায়গায় একখানি বাড়ির প্রকাণ্ড গাড়ি বারান্দার তলায় জমেছে ভিড়—শিশু, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের। কিন্তু তারা সকলেই সাধারণ লোক। পথের তামাসা ভদ্রলোককে আকৃষ্ট করে না। তাই ভিড়ে পরিষ্কার জামা কাপড় ও ভব্য চেহারা বড় একটা চোখে পড়ছে না।

বিজয়কেতু আসছিল স্কুল থেকে। ঢোলের আওয়াজ শুনে সে ঢুকে পড়লো ভিড়ের মধ্যে এবং দর্শকদের জনকতকের বিরক্তি উৎপাদন করে গিয়ে দাঁড়ালো সকলের আগের সারিতে।

সে দেখলে শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছে লেংটিপরা পাকা জামের মতো কালো আট দশ বছরের একটি ছেলে। তার শরীরে যেন এক টুকরোও হাড় নেই। সে যেন আগাগোড়া নমনীয় পেশী দিয়ে তৈরী। সে মাটিতে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে নানা রকমের কসরৎ দেখাচ্ছে। তার পেশীগুলো এমন ভাবে খেলছে যে মনে হচ্ছে, গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউ। তার দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা হচ্ছে নানা রকম। চোখের পলকে শরীর বাঁকছে, বাঁকাচ্ছে, নোয়াচ্ছে. নুইছে। তার শরীরটি কখন হচ্ছে অদ্ভুত, কখন সুন্দর, কখন পাকিয়ে গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখন খুলে ছড়িয়ে বড় হচ্ছে। তার মুখে

শ্রম, ক্লান্তি বা বিরক্তির এতটুকু চিহ্ন নেই, ডাগর চোখ দুটির চাহনি স্বাভাবিক। সে খেলা দেখাচ্ছে, বাজিকরের ঢোলকের তালে তালে কলের পুতুলের মতো।

বিজয়কেতু অবাক হয়ে তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো। সেও ঐ সব কসরতের দু' তিনটে জানে। কিন্তু অত সুন্দর, অমন সহজ আর ওরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলাগুলো দেখাতে পারে না। সে মনে মনে লজ্জা পেল। ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে মনে হলো ছোট। তার অহঙ্কার ও আনন্দের বেলুনটা যেন হঠাৎ গেল চুপসে।

তার পাশ থেকে একটি লোক বলে উঠলো, "ছোঁড়াটাকে তিন বছর বয়স থেকে শিখিয়েছে। না হলে ও অমন কসরৎ দেখাতে পারে? দেখছো না পা দুখানা পিছনে লতার মতো বেঁকিয়ে কি রকম করে মাথায় তুললে?"

এই খেলাটি দেখে বিজয়কেতু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দর্শকদেরও কারো মুখে কথা নেই।

তারপর আর একটি কসরৎ দেখিয়ে খেলা শেষ হয়ে গেল। বাজিকর লোকটি ঢেঙা, কালো। তার মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মাথায় ময়লা কাপড়ের পাগড়ি, খালি গা, খালি পা। সে ঢোলের কাঠিসমেত হাতখানা বার বার কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে দর্শকদের কাছে এসে দর্শনী চাইতে লাগলো। খেলোয়াড় ছেলেটিও এল এগিয়ে।

সে প্রথমেই এল বিজয়কেতুর কাছে। তার দিকে কালো নধর হাতখানি বাড়িয়ে বললে, "দেও খোকাবাবু।"

বিজয়কেতু পকেটে হাত দিয়ে দেখলে কিছুই নেই। সে লজ্জিত হয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। পিঁপড়ের গাঁধিতে এক ফোঁটা জল পড়লে যেমন পিঁপড়েগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে, দর্শকেরাও তেম্নি চারধারে ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ কিছু দিলেও।

বিজয়কেতু বাড়ির দিকে চললো। তার চোখে ভাসতে লাগলো খেলাগুলো। আকাশ আবার অন্ধকার করে এসেছে। সজল বাতাসের একটা দমকা বয়ে গেল। বিজয়কেতু তবুও চললো তেম্নি ঢিমে তালে। কিছুদূর গিয়ে সে হঠাৎ দেখলে, তার আগে আগে চলেছে বাজিকর ও সেই ছেলেটি। বাজিকর থেকে থেকে ঢোলে ঘা দিচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বিজয়কেতু জোর পায়ে চলে তাদের কাছাকাছি পৌঁছেছে এমন সময় কোন রকম সতর্ক না করে নামলো বৃষ্টি, প্রথমে ঝিরি ঝিরি তারপর বড় বড় ফোঁটা।

আর পাঁচজনের সঙ্গেই বাজিকর ও ছেলেটি তাড়াতাড়ি গিয়ে একখানা বাড়ির সরু গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে। বিজয়কেতুও ছুটতে ছুটতে সেই বাড়িরই দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো এবং ভেতরে না ঢুকেই বাজিকরকে হাত নেড়ে বললে, "এই দাঁড়াও। খেলা দেখবো।"

লোকটি তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো যেন তার কথা সে বুঝতে পারছেনা বা বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিজয়কেতু আবার বললে, 'যেও না, আমি আসছি।" বলে সে এক ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল।

বাড়িখানি তাদেরই। ভেতরে ছিল বেশ লম্বা-চওড়া খানিকটা

ঢাকা দালান। দালানের গায়ে খান দুই ঘর—বৈঠকখানা ও পড়বার ঘর। বৃষ্টিটা বেশ জেঁকে এসেছে।

মিনিট কতক পরেই বিজয়কেতু আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে এসে বাজিকরকে বললে, "এই, ভেতরে এস।"

—"কাহে ?"

—"খেলা দেখবো।"

লোকটি ক্ষুদে খেলোয়াড়টিকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বাইরে যারা ছিল তারা একটু পরেই শুনতে পেল ভেতরে ঢোলের আওয়াজ হচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা সাহসী ও অতি কৌতূহলী তারা গেল ভেতরে ঢুকে। দেখলে বারান্দায় একটি ছেলে খেলা দেখাচ্ছে।

তার খেলা দেখতে ওপর থেকে নেমে এসেছেন মেয়েরা, এসেছেন কর্তা, এসেছে কয়েকটি শিশু আর এসেছে চাকর-বাকর।

ছেলেটি যেন আরো কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলছে। বিজয়কেতু বুকে হাত দুখানা আড়াআড়ি ভাবে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন একজন বলে উঠলেন, "বিজুর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।"

কথাটি বিজয়কেতুর কানে গেল, কিন্তু সে বিচলিত হলো না, তেম্নি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

একটু পরে খেলা হয়ে গেল। কর্তা ছেলেটির প্রশংসা করে বাজিকরকে চার আনা পয়সা দিলেন। বড়লোক বাঙালিবাবু দেখে সে বললে, "আউর কুছ্ দিজিয়ে হুজুর।"

কর্তা বললেন, "আর না।"

—"বাবু এতে দুজনের খোরাকি চলবে কি করে?"

—"অন্য জায়গায় যাও।"

—"এতনা বরখামে খেল্ ক্যেইসে হোগা?"

তারপর সে যা বললে, তার মর্ম হচ্ছে তিনদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা ঘর থেকে বার হতে পারে নি। পুঁজি যা ছিল তিন দিন বসে বসে খেয়েছে। বাঙলায় যে এত বর্ষা তা তাদের জানা ছিল না। তারা শুনেছিল "কলকাতা ভারী শহর!" কিন্তু এখন দেখছে, এখানে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে। কারণ খেলা না দেখালে খাবে কি?

কর্তা জিগ্যেস করলেন, "তোমাদের দেশ কোথায়?"

—"জব্বলপুর।"

—"ছেলেটা তোমার লেড়কা?"

—"না। আমার কেউ নেই। ও আমার বোনের ছেলে। বোন মরে গেলে ওর বাপ আবার বিয়ে করে। আমি ওকে তাই নিয়ে এসেছি।"

—"ওকে খেলা শিখিয়েছে কে?"

—"আমি।"

এমন সময় সকলে একটি দৃশ্যে হঠাৎ চমকে উঠলেন। দেখলেন, বিজয়কেতু তার রুপোর পেয়ালাটা এনে ছেলেটির হাতে দিচ্ছে।

কর্তা ও গিন্নী হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এলেন।

কর্তা তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিজয়কেতুকে ধমক দিলেন, "কি হচ্ছে?"

—"ওকে পুরস্কার দিচ্ছি আমার রুপোর পেয়ালাটা। ও আমার চেয়ে ভালো খেলা জানে।"

—"তোমার পেয়ালাটা নিয়ে ও কোথায় রাখবে? ওর ঘর-বাড়ি আছে? এখনি গিয়ে বেচে দেবে। ওরা এর মর্ম জানে?" বলে তিনি গিন্নীর হাতে পেয়ালাটা রেখে বাজিকরকে আরও চার আনা দিয়ে বললেন, "এই ভাগো হিঁয়াসে।"

বাজিকর পয়সাগুলো নিয়ে সদলে সরে পড়লো।

বিজয়কেতু তার আগেই গিয়ে ঢুকেছিল পড়বার ঘরে।

সেদিন থেকে সে পেয়ালাটার আর খোঁজও করে নি। এবং তারপর আরও কয়েকবার কয়েকটি খেলায় সে পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন আনন্দ প্রকাশ করে নি। আনন্দ প্রকাশ করতে গেলেই তার মনে হয়েছে, তার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় হয়তো আছে ঢের। তাদের কেউ রুপোর পেয়ালা দেয় না। তারা পেটের দায়ে যৎসামান্য পেয়ে লোককে নগরে, গ্রামে আনন্দ দিয়ে বেড়ায়।

বাবুর কাণ্ড

ও বাড়ির খোকা মানে বাবুকে নিয়ে বাড়ির লোকেরা ভারী মুশকিলে পড়েচে।

এই অনর্থের মূলে নাকি আছে একখানি বই, সিনেমা ফিলম ও বাবুর এক মাসতুতো ভাই।

বইখানি গোয়েন্দাকাহিনীতে এমন রোমাঞ্চকর যে, বাবু রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ও ছাড়তে পারে নি। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। তখন আধময়লা ঘাগরাপরা একটি মেয়েও মুদির দোকান থেকে একটি বাটিতে আধ-পোয়া সরিষার তেল ও ঠোঙায় আধ সের নুন কিনে বেগুনি খেতে খেতে আসছিল। দুজনেই অন্যমনস্ক ও ব্যস্ত। ফলে রেলগাড়িতে রেলগাড়িতে, মোটরে মোটরে, ট্রামগাড়িতে মোটরে বা বাইসিকলে রিকসায় যেমন ঠোকাঠুকি লাগে সেই রকম ঠোকাঠুকি লাগে। দুর্ঘটনার ফলে কেউ জখম হয় না বটে কিন্তু বাবুর বইখানিতে বাটির তেল, ফুটপাতে মেয়েটির ঠোঙার নুন পড়ে যায়।

মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে; বলে, "ওমা! সব ফেলে দিলে! মুখপোড়া ছেলে—"

বাবু গোয়েন্দাকাহিনী পড়ে গোয়েন্দা বা জালিয়াৎ ও ডাকাতের মতো সপ্রতিভ ও সাহসী হয়ে উঠেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, "দেখে চল্‌তে পারিস্ না? বইখানা তেলে একেবারে—"

মেয়েটি বলে, "তুই দেখে চল্‌তে পারিস্ না ? আমি এখন বাড়ি গিয়ে কি বলবো ?" বলেই কেঁদে ফেলে।

কলকাতার রাস্তা। তৎক্ষণাৎ দুজনকে কেন্দ্র করে চারে মাছের মতো লোক জমতে শুরু করে। বাবু বেগতিক দেখে সরে পড়বার আগেই এক সদাশয় ভদ্রলোক পিছন থেকে তার জামার কলার চেপে ধরে বলেন, "ওহে ! অন্যায় করে আবার পালানো ?"

বাবু "মশাই আপনার কি ?" বলবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়েই দেখে, সদাশয় ভদ্রলোকটি তারই ছোটকাকা।

ছোটকাকা বললেন, "কি বই ওটা ? পড়ার বই তো এত মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় না। কি বই ? 'শেষ রাতের বিভীষিকা'— বটে ?"

জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন টিটকিরি দিয়ে বলে ওঠে "আজ-কালকার ছেলে !" তাঁরা অবশ্য বৃদ্ধ। তাঁদের ছোট বেলায় এ সব বই ছিলই না। থাকলে কি করতেন কে জানে।

একজন বলে, "ওরই বা দোষ কি ? পায় বলেই পড়ে—"

ছোট কাকা বলেন, "এখন ওই মেয়েটির জিনিষ যে লোকসান হলো তার দাম কে দেবে ? খুকী, তুমি কোথায় থাক ?"

"ঐ হোথা।" বলে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে একবার চোখ মুছলো।

সদাশয় ছোটকাকা একটি আধুলি বার করে বললেন,—"তোমার তেল-নুন কিনে নিও।" এবং বাবুকে তেমনি কলার ধরে বাড়িতে এনে মুক্ত হস্তে তার কানে কয়েকটি মোচড়, পিঠে কয়েকটি চড় লাগিয়ে

বইখানি কেড়ে নেন। কিন্তু বাবুর মনে গোয়েন্দা ও দস্যু যে জায়গাটি দখল করেছিল সেখান থেকে তাদের সরানো ছোটকাকার পিতামহেরও সাধ্য ছিল না। তাই তারা রয়ে গেল এবং বাবুকে তাদের কাহিনীতে মশগুল করে রাখলো। বইখানির সবটুকু পড়া হয়নি। তাই সে গোয়েন্দা ও দস্যুর মিলিত কৌশল খাটিয়ে বইখানি গুপ্তস্থান থেকে বার করে একেবারে চিলকোঠার কোণে গিয়ে বসে শেষ করে নিঃশ্বাস ফেললো।

কিন্তু তারপরই মনে পড়লো, ছোটকাকার কথা। উনি কিছুই ভোলেন না। বেলা তখন দুপুর। তার ওপর রবিবার। সকলেই বাড়িতে।

বাবুর মনে মনে রাগ হলো, 'রবিবারে কেন আফিস থাকে না?' এখন বইখানি সে রেখে আসবে কি করে? যদি ছোটকাকা কিছু খুঁজতে ওখানে হাত দেন? আর যদি বই না পান?

সে আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে দেখে ছোটকাকা একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন। তবুও তার পায়ের শব্দে বড় বড় চোখ দুটো তুলে তার পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গেঞ্জির তলায় ওটা কি? দেখি?'

বাবু ভাবলো, গোয়েন্দাকাহিনীতে ম্যাজিকের কৌশলটা কেন দেওয়া থাকে না? তাহলে এই রকম সঙ্কট-ক্ষণে বই কেন নিজেকেই অদৃশ্য করে ফেলা যেত। কিন্তু তা যখন নেই, তখন সে ভয়ে ভয়ে বইসমেত তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ছোটকাকা বইখানি তার হাত থেকে নিয়ে কেবল বললেন, "যাও।"

বাবুর বুক থেকে ভার নেমে গেল। বাবু চলে যাবে এমন সময় বললেন, "শোন, শোন। এ বই কোথায় পেলে?"

বাবু বললে, "কিনেছি।"

"পয়সা কে দিয়েছে ?"

"খবরের কাগজ বিক্রি করে পয়সা জমিয়েছিলাম।"

"হুঁ। তাই আজকাল আমার পুরোনো খবরের কাগজগুলো পাই না। এ সব পড়ো না বুঝলে ?"

বাবু ঘাড় নেড়ে জানালো, বুঝেছে। ছোটকাকা বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখলেন এবং কি একটু ভেবে তখন আর কিছু বললেন না। কিন্তু সেদিন থেকে তিনি তার পিছনে লেগে রইলেন এবং আবার একদিন দেখলেন, সে আর একখানি গোয়েন্দাকাহিনী পড়ছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, বইখানি পড়ার "হরিহর স্মৃতি-গ্রন্থাগারের।" এ রকম বই নাকি সেখানে অনেক আছে।

ছোটকাকা মনে মনে বললেন, এই জঞ্জাল কি করে দূর করা যায় ? দোষ কি বাবুর ? তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তার একটু পরেই এল বাবুর মাসতুতো ভাই। খাসা ছেলেটি ! যেমন তার সাজ-পোশাক, তেমনি চেহারা। ফর্সা রঙ, ওল্টানো চুল।

সে এসেই ফেঁদে বস্‌লো, সিনেমার গল্প। সে কত সিনেমা দেখেছে—কখন দেখেছে বাড়ির কারো সঙ্গে, কখন দেখেছ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সে পড়ে ক্লাস এইটে। কিন্তু দেশী ফিল্ম প্রায় সবই দেখেছে। ফিলম্-স্টার ও স্টারিনাদের সকলের নামই জানে। কার কি বিশেষত্ব তাও জেনে নিয়েছে। বিলাতী ফিল্‌মও দেখে। তবে সব বুঝতে পারে না। কিন্তু দেশী ফিলম কি চমৎকার! বলেই মেঝেয় পা ঠুকে একবার গেয়ে উঠলো, "ম্যয় আলাদীন, আলাদীন !"

পাশের ঘরে তখন বাবুর বাবা সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠে বসেছেন ; বললেন, "কে রে বিশ্রী শব্দ করছে ?"

বাবুর মাসতুতো ভাই থেমে গিয়ে বললে, "আজ যাবি ? খুব ভাল ফিলম আছে—'গুলজার।'

বাবু বল্‌লে, "পয়সা ?"

সেদিন আবার মাসকাবার। মাসীমার আঁচলও খালি। তবে মেজকাকার কাছে সব সময়েই পয়সা থাকে। কিন্তু চেয়ে কেউই পায় না। যারা পায় তাদের সংখ্যাও খুবই কম। সেও দু' একদিন পেলেও তার জন্যে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে এতো যে, তখন মনে হয়েছে, পয়সা হাতে হলেই মেজকাকাকে ফিরিয়ে দেবে। সে বড় হয়ে যখন পয়সা রোজগার করবে তখন দুহাতে পয়সা ছড়াবে। একদিন তার মনের অবস্থা হলো ঐরকম। সে চারটি পয়সা নিয়ে নিজের জন্যে চীনাবাদাম ভাজা, টফি বা আইসক্রিম কিনতে যাছে। পয়সা চারটি মেজকাকাই দিয়েছিলেন। তার ছোট বোন মঞ্জরী এসে বললে, "দাদা! আমায় ঐ থেকে দু পয়সার চীনে বাদাম দিবি ?"

বাবু বলে, "আজ না। পরে দেব।"

"সেদিন যে আমি তোকে দিলাম।"

"তার আগে যে আমি দিয়েছি।"

"কৈ দিয়েছিস্ ?

"দিই নি তো বেশ করেছি। দেব না। কি করতে পারিস্ ?"

মঞ্জরী ছোট মেয়ে। কিই বা করতে পারে ? তার মহাস্ত্র হলো ক্ষুদে দাঁতের পাটি। শত্রুর গায়ে তাই বসিয়ে দেয়। সেদিনও দেবার

জন্য ছুটেছিল। কিন্তু বাবুর সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? বাবু ছুট্‌তে ছুট্‌তে একেবারে রাস্তায় একখানি চলন্ত মোটরের সামনে! ড্রাইভার বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে একখানা রিক্সকে দিয়েছিল তেবড়ে।

যাক্। সে অতীতের কথা। সে আস্তে আস্তে মেজকাকার ঘরের সামনে গেল। মেজকাকা খুব ইংরেজী বই পড়তে ভাল বাসেন। মেজকাকীমা আবার পড়াশুনো পছন্দ করেন না। বই দেখলেই বলেন, "যত রাজ্যের জঞ্জাল জড় করেছে।" মেজকাকার বইগুলো যেমন মোটা তেমনি তার কি চমৎকার গন্ধ! কাউকেই তাতে হাত দিতে দেন না। কিন্তু লোকটি ভারী অন্যমনস্ক। অনেক সময় খেতে খেতে দু-একটা তরকারিই খেতে ভুলে যান। একবার মেজকাকীমাকে তাঁর বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে গিয়ে ভুলে কালীঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন! উনি কখন কখন ভুলে মনিব্যাগটি বইয়ের শেলফে তুলে রেখে মনিব্যাগ মনে করে ডায়েরি পকেটে নিয়ে বার হ'ন!

তা বাবু দেখলো, মেজকাকা বিছানায় আর মেজকাকী মেঝেয় মাদুরে বুবুকে নিয়ে তখনও ঘুমোচ্ছেন। বাবু দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগ লো।

ঐ যে! তার কপাল কি ভাল? মেজকাকার বুকের কাছে চার-পাঁচটি সিকি আধুলী এবং একখানি ক্যাশমেমো পড়ে।

বাবুর এত আনন্দ হলো যে, সে তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা-দস্যুর সতর্কতার সঙ্গে কাকীমার মাথার কাছ দিয়ে গিয়ে একটি আধুলি তুলে নিয়ে যেমনি আসতে যাবে অমনি বুবু বলে উঠলো, "দাদা!" বলেই খিল্ খিল্ করে হাসলো।

বাবু বুবুকে খুব ভালবাসে।

মেজকাকীমার ঘুম তরল হয়ে এল ; ঘুমের ঘোরেই বললেন, "উঃ ! ও এখন ঘুমোচ্ছে ! যা—"

মেজাকাকা কাৎ হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে চিৎ হলেন। বেশ জোরেই নাক ডাকতে লাগলো।

বাবু তাড়াতাড়ি এসে তার মাসতুতো ভাইটিকে বললে, "চল্।"

সে বললে, "কার কাছে পয়সা পেলি ?"

"মেজকাকার।"

"তোর মেজকাকা তো খুব ভাল !"

"হুঁ।"

তারপর দুজনে 'গুলজার' দেখতে গেল। তাদের মতো কত ছেলে কিউ করে টিকিটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। যথাসময়ে টিকিট কিনে দুজনে গুলজার দেখলো। দুজনের বাকি পয়সায় 'সলটেড বাদাম' ও পান কিনে খেল। বাবুর মাসতুতো ভাই একবার সিগারেট খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সাহসে করোই কুললো না।

সিনেমা ভাঙ্গতে মাস্তুতো ভাই বাড়ির পথ ধরলো আর বাবু এল বাড়ি ফিরে।

এসেই সে শুনতে পেল, মেজকাকার বিছানা থেকে আটআনা পয়সা চুরি গেছে এবং কে নিয়েছে, তাও জানা গেছে। সবাই বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

শুনেই বাবু আর দাঁড়ালো না। চুরি সে করেছে সত্যি কিন্তু সে কলঙ্ক বইবার মতো শক্তি তার হলো না। সে বাড়ি থেকে পালালো।

কিন্তু ছোট ছেলে যাবে কোথায় ও কতদূর? তবুও হাঁটতে হাঁটতে গেল গঙ্গার দিকে এবং পোস্তার জেটিতে পোঁছে সেখানে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। তখন সন্ধ্যা। তার মনে তখন কি হচ্ছিল, ঠিক বলতে পারবো না। এক একবার মনে হচ্ছিল, নিয়েছে তো মোটে আট আনা। তার জন্যে এত? তা সত্বেও ঐ সঙ্গে মনে হচ্ছিল, এটা চুরি। কেন সে চুরি করলো? কি লজ্জা!

ঠিক সেই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, সেদিনকার সেই ঘাগরা পরা মেয়েটি। সে যাচ্ছিল, একটি লোকের হাত ধরে।

সে বাবুর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে লোকটিকে বললে, "বাবা, ঐ সেই ছেলেটা।"

"কোন্ ছেলে?"

"সেই যে আমার তেল-নুন ফেলে দিয়েছিল।"

লোকটি বাবুর দিকে কৌতূহলভরে তাকালেন। তিনি পোস্তায় একটি আড়তে খাতা লেখেন। বাবুকে জিগ্যেস করলেন, "খোকা, তুমি একা এখানে বসে .য?"

বাবু অস্পষ্ট স্বরে কি একটা উত্তর দিয়ে উঠে একদিকে যেতেই লোকটি হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে বললেন, "বাড়ি থেকে রাগ করে এসেছো বুঝি? সেদিনও একটি ছেলে বাড়ি থেকে এখানে এসে—বাপ মায়ের কি কষ্ট! চল—চল—বাড়ি চল" বল্‌তে বল্‌তে লোকটি বাবুর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

পথে দু-একজন জিগ্যেস করলে, "কি হয়েছে, মশাই?

"কি আর হবে, বলুন? শাস্তির ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনই হয়তো একটা কাণ্ড করে বস্‌তো। আর বাপ-মা বুক চাপড়াতো!”

লোকটি বাবুকে যখন বাড়ি পেঁৗছে দিলেন তখন একটু রাত হয়েছে। চারধারে তার খোঁজে লোক ছুটাছুটি করছে।

তারপর? তারপরের ঘটনা আর বলতে চাই না। কিন্তু সবাইকে জিগ্যেস করি—এমন হবার মূলে সত্যিই কি একখানি বই, একটি ফিলম ও তার মাসতুতো ভাই?

খোকার মাস্টার

মথুরবাবুর ছোট ছেলের মাস্টারমশাই সন্ধ্যায় পড়াতে এসে শুনলেন, খোকার গা গরম হয়েছে বলে সে আজ পড়বে না। ওদিকে বাড়িতে তাঁরও বড় ছেলেটি জ্বরে বেহুঁশ। তাই মনে করেছিলেন, সাকাল সকাল ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবেন। কিন্তু ছুটি নেবার আর দরকার হলো না, বাড়ি ফিরে চললেন।

মথুরবাবু সামনের ঘরে গদি-পাতা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রুপোর গড়গড়া টানছিলেন। ভাদ্রমাসের পচানো গরম হলেও তিনি পাখা ছাড়েন নি এবং আলোটিও জ্বালেন নি।

মাস্টারমশাইয়ের পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, "কে ? মাস্টার ?"

কর্তা সকলেরই পায়ের শব্দ চেনেন।

মাস্টারমশাই বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খোকার আজ গা গরম হয়েচে—পড়বে না"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি—"

"তোমার তো ছুটি। এস একটু কথাবার্তা কই তোমার সঙ্গে। এমন একটা লোক পাইনে যে দুটো কথা কই—"

মাস্টারমশাই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ্ঞে আমার—"

মথুরবাবু বললেন, "আরে তোমরা হলে মাস্টার মানুষ। তোমাদের সঙ্গে কথা কইবো না তো কইব কার সঙ্গে ? এস সোজা উঠে এস।

আমি উঠ্‌তে পারচি না। নাহলে সুইচটা টিপে আলো জালতুম। রঘুবেটাও আলো জ্বেলে দিয়ে যেতে ভুলে গেচে। আজকালকার চাকরবাকরও হয়েচে এমন! একটা চড়া কথা কইবার যো নেই। অমনি বলবে, চললুম। বোস—বোস—ঐ চেয়ারটায়—"

মাস্টারমশাই অগত্যা বস্‌লেন, বসেই উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন।

কর্তার চোখ অন্ধকারেও জ্বলে; বললেন, "ছারপোক হয়েচে? তা হবে না? ট্রাম থেকে কাপড়ের সঙ্গে এসেচে। ঐ জন্যে আমি ট্রামে-বাসে চড়ি না। মটোরে মটোরে যদ্দুর হয়। ঠিক কাজ করি না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু—"

"খরচের কথা বলচো? তা আর কি করচি বল? যা দরকার তা তা না করলে শুনচে কে? ঐ ধর না, রোজ সকালে কাঁচা বাজার দরকার সাত টাকার।"

মাস্টারমশাই মরীয়া হয়ে বললেন, "কিন্তু টাকা না থাকলে—"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কর্তা বললেন, "ঐ যে বললুম, না করলে শুনচে কে? যা দরকার তা তো করতেই হবে। তবে হ্যাঁ বলতে পারো, সাত টাকার জায়গায় পাঁচটাকা খরচ করবো। তা যা দিন-সময় পড়েচে তাই করতে হবে।"

মাস্টারমশাই মনে মনে বললেন, "আমার ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। তাকে দরকারমতো ডাক্তার দেখাতে আর ওষুধ দিতেও পারি নে। জানি না সে এখন কেমন আছে। জর বাড়লো না কমলো?"

দরজায় এসে দাঁড়ালো একটি ছায়ামূর্তি। কর্তা হাঁকলেন, "কে র‍্যা?"

"আমি উদয়। গিন্নীমা বললেন, খোকাবাবুর জ্বর বেড়েছে।"

কর্তা উঠে বসে বললেন, "বেড়েচে? ডাক্তারকে খবর দে। আর আমার কলকেটা বদলে দে যা—এই ছাখো মাস্টার একটা বাজে খরচ। বচরে কটাই বা অসুখ হয়? কিন্তু আমার বড় ছেলের খেয়াল বাঁধা-ডাক্তার রাখতে হবে। সিদিন বললুম, বাঁধা ডাক্তারের কি দরকার? অমনি বাবুদের রাগ! কোত্থেকে এতসব করি বল তো? যা কিছু হচ্চে সবই তো বাপ-পিতেমো যে খুদ-কুঁড়ো ক'টি রেখে গেচে তাই নেড়ে-চেড়ে। সেদিন কি আর আছে? সে-সব তাঁদের সঙ্গেই হয়ে গ্যাচে। ঐ তো ক'খানা বাড়ি আর খানকয়েক কাগজ। আজকাল ভাড়াটেও হয়েচে এমন যে, ভাড়াও দেবে না। উল্টে রেন্ট্‌কোর্টে গিয়ে নালিশ করবে। ধর্মের দিন আর নেই মাস্টার! আরে বাপু জিগ্যেস করি, আমরা দু'চারখানা ছাউনি তৈরি করেচি বলেই তো তোরা থাকতে পারচিস? নইলে থাকতিস্ কোথায়? চেয়ারটা ঘুরিয়ে ভাল হয়ে বস মাস্টার। আজ তো তোমার ছুটি।"

মাস্টারমশাই বললেন, "আজ্ঞে, বাড়িতে আমার ছেলের—"

"বুঝেচি পড়াটা একটু দেখতে চাও। ও তো আছেই। লেখাপড়া নিয়েই তো আছ। আজ একটু ছুটি পেয়েচো, জিরোও। মাঝে মাঝে জিরোনো দরকার নইলে খাটবে কি করে? যারা খাটে তাদের জীবন কি সুখের, কি শান্তিময়! তাই নয় মাস্টার? গদিতে শুয়েও যাদের ঘুম হয় না, তাদের গদি থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান। এই আমার বাড়ির সামনে ফুটপাথে যে কুলিগুলো ঘুমোয় ওদের জীবন কি শান্তিময়! ওদের গদি-তাকিয়ার দরকার হয় না। কাজ সেরে এলো।

এসেই ময়লা কাপড়খানা রাস্তায় বিছিয়ে দিলে। তারপর তার ওপর শুতে না শুতে নাক ডাকতে লাগলো। এত ঘুম যে রেতে মটোর থেকে নেমে ওদের জা গয়ে তবে মটোর চালিয়ে আনতে হয়। আর তোমার গদিতে শুয়েও ঘুম হয় না, ছটফট কর ; যা খাও হজম হয় না। আর ওরা ? যা খাচ্চে তাই হজম হয়ে যাচ্চে। তুমি যদি বন্দুকের ছর্‌রা খেতে দাও তাও খেয়ে ওরা হজম করে ফেলবে! আর তুমি একটির বেশি দুটি দেলখোশ সন্দেশ খেয়েচো কি নানান্ উপসর্গ! ডাক ডাক্তার, গেলো ওষুধ, মেয়েরা ভেবে ভেবে—কি হলো ? অমন করচো কেন ?"

মাস্টারমশাই বললেন, "দেখুন, আমার বড় ছেলেটির আজ সকাল থেকে খুব জ্বর। আমি—"

"ওরে উদো—উদো ব্যাটারছেলে!" কর্তা হাঁকলেন।

"আজ্ঞে এই যে—" বলে বড় কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে উদয় এল। তার পিছু পিছু একখানি রেকাবের ওপর একটি রুপোর গেলাস বসিয়ে নিয়ে এল রঘু।

উদয় আলো জ্বেলে দিতেই ঘরখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। পাথরের ওপর ঝিনুকের কাজ করা টেবিল, ছাদের লাল-নীল কাচের আলোরঝাড়, দেওয়ালের বিলাতী তৈলচিত্র, কর্তার হাতের আংটি ঝকঝক করতে লাগ্‌লো।

মথুরবাবু কোমরে কাপড়ের কষি আঁটতে আঁটতে গেলাসটি তুলে নিয়ে তার মধ্যকার রক্তিম পানায়ের এক চুমুক খেয়ে মুখ থেকে পাতিলেবুর একটি বীচি জিভ দিয়ে পুচ্ করে বার করে ফেলে বললেন, "হ্যাঁরা! খোকাবাবু এখন কেমন আচে ?"

রঘু বললে, "ঐ রকম।"

"ডাক্তার ডাকতে গ্যাচে ? কে গ্যাচে ?"

"সরকারবাবু।"

কর্তা আজ বার্ হন নি বলে দাঁত দুপাটি খুলে জলে ভিজিয়ে রেখেছেন।

রঘু চলে গেল। উদয় রুপোর নলটি কর্তার হাতে তুলে দিয়ে জিগ্যেস করলে, "আলো ?"

"থাক্। তুই যা। বুঝলে মাস্টার! ছেলে-পুলের অসুখ করলে মন বড্ড অস্থির হয়। এই ছ্যাখ, আমার বুকের বাঁ ধারে, এই এখানে ব্যাতা হয়। ডাক্তার বলে, করোনারি থ্রমবসিস্ হচ্চে। একজন সিদিন বললে, 'ও হলো তোমার শরীরে অত্যাচারের ফল।' কি অত্যাচার করিচি বল তো যে এটা হব্যা ? এই অ্যালোপ্যাথিটা শ্রেফ্ জুচ্চুরি। একটা রোগ হলেই ডাক্তার বলবে, 'এ পরীক্ষা করাও, ও পরীক্ষা করাও।' তবে তুই আচিস্ কি করতে ? উঠলে যে ? এরই মধ্যে যাবে ? ছুটির দিনে একটু বসে গপ্পসপ্প কর। কাজ তো আচেই, না মলে ও থেকে তো আর নিষ্কৃতি নেই।"

মাস্টার মশাই বললেন, "আমার ছেলেটির খুব অসুখ—"

তখন দেওয়াল ঘড়িতে জলতরঙ্গের সুরে বাজলো আটটা! মাস্টার-মশাইয়ের পড়াবার কথাও আটটা পর্যন্ত।

কর্তা উদার ভাবে বললেন, "যাও—যাও। তা' কথাটা আগে বলতে হয়!"

মাস্টারমশাই সেখানে থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চললেন বাড়ির দিকে।

একখানা মোটর তাঁকে বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে হুস্‌ করে চলে যেতে তাঁর হুশ হলো। হুঁশ হলো যে চাপা পড়ছিলেন। শুনতে পেলেন, একজন আরোহী বলছে, "লোকগুলো যখন রাস্তা দিয়ে চলে—"

গাড়িতে ছিলেন ডাক্তারবাবু ও কর্তার সরকারমশাই।

এর পাঁচদিন পরে!

সেদিন সবে ভোর হয়েছে। একখানি ছাই রংয়ের নতুন মোটর এসে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির গলির মুখে দাঁড়ালো। প্রকাণ্ড গাড়ি, গলিতে ঢোকবার উপায় নেই। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো। পুরোনো বাড়ি। মাস্টারমশাই নিচের তলাতেই আড়াইখানি ঘর আর আড়াই লক্ষ আরসুলা নিয়ে সপরিবারে বাস করচেন তা অনেক দিন হলো। যখন আসেন তখন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ চল্‌ছে এবং সন্তানের মধ্যে একটি পুত্র। তারই অসুখের কথা কর্তাকে সেদিন বলেছিলেন। এই বাড়িতেই হয় তাঁর আরও তিনটি সন্তান। নিচে আরও দু' ঘর ভাড়াটে থাকলেও মাস্টারমশাই-ই এসে খিল খুলে দিলেন। এবং দরজা খুলেই দেখেন, সামনে মথুরবাবুর ড্রাইভার বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথ নমস্কার করে বললে, "মাস্টারবাবু, কর্তাবাবু আপনাকে এখনই একবার ডাকছেন। গাড়ি পাঠিয়েছেন, চলুন।"

মাস্টারমশাই বিমূঢ়ের মতো ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ড্রাইভার আবার বললে, "খোকাবাবুর খুব অসুখ। তিনি অসুখের ঝোঁকে আপনার নাম করছেন। অবস্থা খারাপ।"

মাস্টারমশাই একটি নিশ্বাস ফেলে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কি যেন বলতে চাইছেন অথচ পারছেন না।

ড্রাইভার বললে, "যাবেন না ?"

"যাবো। চল। জামাটা গায়ে দিয়ে আসি—" বলে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

তিনি জামাটা গায়ে দিয়ে চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময়ে সেজ মেয়েটি বললে, "বাবা, কোথায় যাচ্ছ ? আমি যাবো।"

গৃহিণীও বললেন, "এত সকালে যাচ্ছ কোথায় ?"

মাস্টারমশাই বললেন, "মথুরবাবু গাড়ি পাঠিয়েছেন। খোকাকে দেখতে যাচ্ছি। খুব অসুখ।" বলে আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু মথুরবাবুর বাড়ি পৌঁছে তাঁকে আর ভেতরে যেতে হলো না। কান্নার শব্দে দরজা থেকেই বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

আবার একমাস—হাঁ ঠিক একমাস পরেই গেলেন পাওনা টাকা কয়টি আনতে। উৎসাহ না থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদেই গেলেন।

কর্তাবাবু ছিলেন না, সরকারমশাই খোকাবাবু অসুখে পড়ার আগের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ কর্তাবাবুর সঙ্গে যেদিন গল্প করেন তার আগের দিন অবধি ছাব্বিশ দিনের মাইনে হিসেব করে চুকিয়ে দিতে দিতে বললেন, "খোকাবাবু মারা যাবার পর আপনি যদি কর্তাবাবুকে সান্ত্বনা দিতে একটি বারও আসতেন তাহলে ছোটখুকীকে পড়াবার ভারও

পেতেন। দেখুন, আমরা হলাম চাকর। মনিবদের মন না যোগালে বাঁচবো কি করে? খাব কি? আমাদের কর্তাবাবুর মস্ত গুণ, উনি কারো সঙ্গে তঞ্চকতা করেন না। লোকের পাওনা-গণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে মিটিয়ে দেন।"

মাস্টারমশাই বলতে পারলেন না যে, তাঁরও খোকাটি তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে! তিনি টাকা কয়টি নির্লিপ্তের মতো হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্তা তখন মোটর থেকে নেমে বাড়ি ঢুকছেন। ফটকে দুজনে সামনা-সামনি দেখা। মাস্টারমশাই হাত তুলে নমস্কার করলেন। মথুরবাবু ফিরেও তাকালেন না।

ভারাক্রান্ত মনে পথ দিয়ে চলতে চলতে বাড়ির কাছে আসতে দুটি স্কুলের ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের সামনে পড়লো।

তারা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, "রতনের বাবা।" রতন ছিল তাদের খেলার সাথী।

মাস্টারমশাইয়ের দু' চোখ জলে ভরে উঠলো। কিন্তু তিনি তেমনি চলতে লাগলেন। তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে গলাধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইলো। কি দেখলো, কি বুঝলো তারাই জানে!

বেদের ছেলে

আমাদের গাঁয়ের নাম কুমীর পোতা, কিন্তু এর এক ক্রোশের মধ্যে নদী নেই ; আধ-ক্রোশটাক দূরে এক সময়ে নাকি একটা বড় বিল ছিল। সেখানেও এখন বড় জঙ্গল। জঙ্গলটার নামও অদ্ভুত—হাতী-ডোবা। শোনা যায়, বিলটার নামানুসারেই জঙ্গলটার নাম। সেই বিলের কাদায় সত্যিই একবার রানীহাটের জমিদারদের একটা হাতী বসে গিয়েছিল। তবে এ সব অনেককাল আগের কথা। পল্লীর যে দু-এক জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছেন, তাঁরাই নাতি-নাতনীদের সেই পুরোনো দিনের গল্প বলেন। বলে আনন্দও পান। কেউ তা অবিশ্বাস বা তা নিয়ে পরিহাস করলে, তাঁরা রুষ্ট ও ব্যথিত হন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সুকুমারমতি যারা, তারা বৃদ্ধদের হৃদয় বোঝে না, তাঁরাও বোঝাতে পারেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই যায় বেড়ে।

ঠাকুরদার মুখে শুনেছি—একবার শীতকালে যেন কোথা থেকে কি করে ছোট একটি হরিণের পাল ঐ হাতীডোবার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয়। কেউ বলে বাঘের তাড়া খেয়ে, কেউ বলে ইছামতীর ধারে ধারে যে জঙ্গল আছে সেখানে কুমীরের অত্যাচারে তারা খানিক ভেতর দিকে সরে আসে। তখন হাতীডোবার জঙ্গল আর ইছামতীর জঙ্গলে সামান্য যোগও ছিল। এটা আমরাও কিছু বড় হয়ে দেখেছি, মনে পড়ছে। এখন অবশ্য নদী ও জঙ্গলে অনেকটা ছাড়াছাড়ি। দুয়ের মাঝখানে একখানা মাঠ। খেয়াঘাট থেকে মাঠের ওপর দিয়ে জঙ্গলের

মাঝ দিয়ে একটি পথ এসে গাঁয়ের বটতলার পুরোনো শিবমন্দিরটির সামনের সড়কে মিশেছে।

গাঁয়ের পুরোনো দিনের কথায় ঠাকুরদা আর একদিন বললেন, "সেবার তখনও ভাল করে বর্ষা নামে নি। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু বৃষ্টি নেই; গাঁয়ের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া চলে যায়, একটানা হাওয়ায় নারিকেল, তাল আর খেজুর বনের সারা দিনরাত সর্ সর্ শব্দে দোলে। বাগানভরা পাকা আমের মিঠে গন্ধে গাঁ মেতে উঠেছে। গরম যায় না। সবাই আশা করছে, যে-কোন একদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়বে। এমন সময়ে একদিন বৃষ্টির বদলে এল একপাল বেদে!

"তারা এসে ঐ হাতীডোবার জঙ্গলে আস্তানো গাড়লো। অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের সাবধান করতে লাগলেন, চির-রুগ্নরা ওষধির আশায় তাদের আস্তানায় যাওয়া-আসা করতে লাগলো। আর, যারা ছিল দুর্বৃত্ত তাদের সেদিকে আনাগোনা চলতে লাগলো চুপি চুপি। বেদেরা কিন্তু প্রথম প্রথম গাঁয়ের ত্রিসীমানায় এল না। শোনা গেল, তারা ঘোরাফেরা করছে হাটবাজারের দিকে, খেয়াঘাটেও তাদের হামেসাই দেখা যায়।

গাঁয়ের পূব দিকে পুকুরপাড়ে ব্রজদাসের ঘর। ছোট একটু বাগানের মধ্যে একখানি মাত্র কুঁড়ে। গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়স বেশি ছিল তার। নব্বই বছরের কাছাকাছি। গায়ের রঙ কালো, গলায় তুলসীকাঠের কণ্ঠী, মাথায় কাশফুলের মতো শাদা চুল, মুখে তেমনি শাদা পাতলা দাড়ি, কিন্তু দাঁত ছিল না একটিও। তার চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বর ছিল বড় কোমল। কিসে যে তার দিন চলতো

জানি নে, কোন দিন তাকে ভিক্ষে করতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

কিন্তু হাতীডোবায় বেদের পাল আসবার কয়েকদিন পরে একদিন ভোরে দত্তদের বাগানে আম কুড়োতে গিয়ে দেখি, বুড়ো লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে শিবমন্দির ছাড়িয়ে হাতীডোবার জঙ্গলের দিকে চলেছে। দেখে কৌতূহল হলো, কিন্তু পিছু নিতে সাহস হলো না বরং গা একটু ছম্ ছম্ করতে লাগলো। কারণ, তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি; গাছের ডালে, পাতার তলায়, গাছের গোড়ায়, মন্দিরের কোলে একটু একটু অন্ধকার লেগে ছিল। এদিকে ওদিকে দু-একটি জোনাকি পিট্ পিট্ করছিল। আকাশের গায়ে দু-একটি তারা ফ্যাকাশে হয়ে জ্বলছিল। তবুও যথাসম্ভব সাহসে ভর করে, খুব ভাল করে, নজর করে দেখলাম, লোকটা আর কেউ নয়, বুড়ো ব্রজদাসই বটে! কিন্তু আমার আম কুড়োতে কি জানি কেন আর উৎসাহ হলো না। বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়ে মন্দিরের ধারে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। ক্রমে আলো ফুটলো, লোকজনের চলাফেরা শুরু হলো। একটু পরেই দেখি বুড়ো ফিরে আসছে, সঙ্গে এক বুড়ো বেদে। তার পাশে একটা কালো রঙের কুকুর। কুকুরটার চেহারা অনেকটা নেকড়ের মতো, চোখে সবুজ আলো, লেজে প্রচুর লোম।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে খবর রটে গেল, 'ব্রজদাস একটা বুড়ো বেদকে সঙ্গে করে গাঁয়ে এনেছে। তার সঙ্গে একটা নেকড়ে বাঘ।'

অমনি তাদের পিছু নিলে ছেলে-বুড়োর এক কৌতূহলী-জনতা। মেয়েরাও বাড়ির উঠোনে, ঘরের কানাচে, বাগানে দাঁড়িয়ে দেখতে

লাগলো। কুকুরটা ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক একবার জিভ, শাদা দাঁতগুলো বার করলেও বেদে বা ব্রজ কেউ কোনদিকে তাকালো না। দুজনে নীরবে চলতে লাগলো। শেষে তারা গিয়ে পৌঁছলো পুকুরধারে। অনেককালের পুকুর। তার পশ্চিম দিকে শালুক আর কলমীর বন, পূব দিকটা পরিষ্কার। সেইদিকে ছিল পুরোনো সান-ভাঙা ঘাট। ঘাট থেকে হাত তিরিশেক তফাতে একটা অশ্বত্থগাছ। তার গোড়ায় থাকতো এক জোড়া গোখরো সাপ। পুকুরটা ব্রজদাসের ছিল নিজস্ব। শোনা যায়, ব্রজ যৌবনে ডাকাতি করে ধন-দৌলত এনে ঐ পুকুরে লুকিয়ে রাখতো। একবার নাকি কার একটা ছেলেকে এনে ঐ পুকুরে ডুবিয়ে মারে। যার ছেলেকে মেরেছিল, সেও নাকি ব্রজর বড় ভাইকে হাতীডোবার বিলে ডুবিয়ে মেরেছিল। শোকে ব্রজর বাবা হয়ে গিয়েছিল পাগল। বুড়ো শেষে ঐ অশ্বত্থগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তাই ব্রজ তার শোধ নেয় লোকটার একমাত্র ছেলেকে ঐ অশ্বত্থগাছের সামনে পুকুরে ডুবিয়ে মেরে। তারপর সে লোকটাও যায় নিরুদ্দেশ হয়ে। যাবার আগে সেও নাকি বলে যায় যায় "বেজা, এর শাস্তি ভগবান দেবেন।"

ব্রজ বলে, "আমার বাপের বুকখানা যখন ভেঙেছিলি তখন মনে ছিল না? ভগবান কাণা নয়। বাপের ঋণ আজ শুধলাম।"

এরপর থেকেই ব্রজদাসের বাড়ির দিকে সাপের উৎপাত শুরু হয়। ব্রজর স্ত্রীকে একদিন সন্ধ্যাবেলা সাপে কামড়ে মেরে ফেলে। তার দিন কয়েক আগে হাতীডোবার বিলের ধারে একপাল বেদে এসে আস্তানা গেড়েছিল। তারা গাঁয়ে আসতো। সেখানে দিন কয়েক

থেকেই তারা ব্রজর স্ত্রীকে সাপে কাটবার পরদিন ভোরে চলে যায়। যেদিন যায় সেদিন থেকেই ব্রজর একমাত্র ছেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। এ হলো পঁয়ষট্টি বছর আগের ঘটনা। কৃষ্ণের বয়স তখন ছিল চার বছর। ব্রজ ছেলের খোঁজে কত জায়গায় যে ঘুরেছে। তবুও ছেলে বা সেই বেদের পালের সন্ধান পায় নি। শেষে হতাশ হয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে। তারপর থেকে ঐ কুঁড়েতেই বাস করছিল। আবার বহুকাল পরে গাঁয়ের ধারে সেদিন একপাল বেদে এল। কিন্তু তখন সে হাতী-ডোবার বিলও নেই, ব্রজর ছেলেও নিরুদ্দেশ। এ সব কাহিনী লোক-মুখে শোনা। তাই এর মধ্যে কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা আছে জানি নে। কিন্তু সেদিন দেখলাম ঐ দৃশ্য। কেবল আমি নয়, গাঁয়ের প্রায় সকলেই দেখ্‌লো।

হরিদত্ত ছিলেন গাঁয়ের মাতব্বর, তাঁরও বয়স নব্বই না হলেও সত্তরের ওপর হবে। ব্রজ তাঁরই সঙ্গে দু' একটা কথা বল্‌তো। সবাই তফাতে দাঁড়িয়ে রইলো। কেবল তিনিই হুঁকোটি হাতে করে খড়ম পায়ে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, "ও খুড়ো, কাকে সঙ্গে আনলে ?"

ব্রজর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছিল, বললে, "আমার কেষ্টকে।"

"কি রকম ? ও তো বেদে।"

"বেদে নয়—বেদে নয়—ও আমার কেষ্ট।"

"প্রমাণ কি ?"

"ওই তো ওর ডান কানের লতি কাটা, কপালের বাঁ দিকে কাটা দাগ। ছেলেবেলায় ওর মা কান বিঁধিয়ে দুটো রুপোর মাকড়ি পরিয়ে

দিয়েছিল। ও ঘুমের ঘোরে মাকড়ি ধরে এমন টান দেয় যে, লতি ছিঁড়ে মাকড়ি বেরিয়ে আসে। আর একদিন কাটারি দিয়ে ডাব কাটতে গিয়ে নিজেই নিজের কপালে বসায় কোপ।”

“ও নিজের পরিচয় কিছু দিয়েছে ?”

“এখনও ভাল করে কথা হয় নি। অনেক কাকুতি-মিনতি করে ওকে এনেছি।”

“তবে ঘরে বসাচ্ছো না কেন ?

“গেল না। বললে, দম আটকে যাবে। তুমি ওদের ওখান থেকে যেতে বল।” বলে ব্রজ আমাদের হাত দিয়ে দেখালে।

হরিদত্ত দু' একটা ধমক দিতেই সকলে একে একে সরে গেল। তবুও দু' একজন 'যাই যাই' করতে করতে রইলো। দত্তমশাই আবার বললেন, “এখনও গেলে না ? লোকটা মন্তর-টন্তর জানে। কার ওপর কি করে বসবে। সেইটেই ভাল হবে ?”

এরপর আর কেউ থাকতে সাহস পেল না। সেখানে রইলো কেবল ব্রজ, বেদে, হরিদত্ত আর সেই কুকুরটা। কুকুরটা অশ্বত্থ তলায় গিয়েই একবার 'ঘেউ' করে ডেকে উঠ্‌লো। বুড়ো বেদে অমনি গাছের গোড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখে এক পাশে সরে বস্‌লো।

ব্রজ তার গায়ে হাত দিয়ে ছল ছল চোখে বললে, “বাবা, তোর জন্যেই আমার প্রাণটা এতদিন আছে। তোকে কত দেশ খুঁজেছি। পাহাড় দেখেছি, সমুদ্দুর দেখেছি, মরুভূমিতে বেদের পালের পিছু নিয়েছি। বাবা কেষ্ট, কতকাল পরে তোর দেখা পেলাম। আর তোকে ছাড়বো না।”

লোকটি এক দৃষ্টিতে ব্রজর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগলো।

মাতব্বর তাকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ে ?"

লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে "কিছু।"

"তোমার বাপ্‌কে চিনতে পারছো না ?"

লোকটা ব্রজর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "না।"

ব্রজ বলে উঠলো, "হাঁরে! এত বড় কথা বললি ? আমি যে তোকে দেখেই চিনেছি।"

মাতব্বর বললে, "একে কবে দেখেছো খুড়ো ?"

"ব্রজ বললে, 'কদিন ধরেই ওদের আস্তানায় আনাগোনা করচি। ও হলো দলের সর্দার। ওর বউ আর আমার নাতি-নাতনীদেরও দেখলাম। তারা সব বড় বড়। নাতিটা দশাসই জোয়ান। কি বুকের ছাতি! ওকে কত সাধ্য-সাধনা করে আজ এখানে এনেচি।'

"বেদে হঠাৎ বলে উঠলো, 'এই তালাও—হাঁ—এই তালাও। কিন্তু তুমি—'

"ব্রজ বললে, 'তোর বাপ-মায়ের কথা কি কিছুই মনে পড়চে না রে কেষ্ট ? আমি যে—' বলে বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলো।

"বেদে আস্তে আস্তে বললে, 'সর্দারের কাছে শুনেচি একজন আমাকে তার কাছে বেচে দিয়েছিল। দাম নিয়েছিল দু' মোহর। সর্দার মরবার আগে আমাকে এ সব কথা বলে। আমার মতো আরও একটি মেয়ে সে কিনেছিল। তার নিজেরও মেয়ে ছিল। সর্দার তারই

সঙ্গে তার ছেলের সাদী দেয়। আর আমার সাদী দেয় নিজের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু ছেলেটা বাঁচে না। মরে যায়। তার বউটা চলে যায় আর এক দলের একজনকে বিয়ে করে। তারা এখন আছে ইরানে। আমরাও ইরান, তুরান, কাবুল ঘুরেছি। তামাম হিন্দুস্তান দেখেচি— পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্দুল, সুখাডাঙা এ সব আমাদের এলাকা।'

"ব্রজ বললে, 'তোর বাপ-মায়ের মুখ মনে পড়ে না রে?'

"বেদে বললে, 'অল্প অল্প।'

"দত্তমশাই বললেন, 'খুড়ো, তোমার হিসেবে এর বয়স এখন কত?'

"তিন কুড়ি চার বছর। চার বছর বয়সে ওর মা মরে। ও-ও হারিয়ে যায়। ও যেদিন হারিয়ে যায় তার আগের দিনই ওর মাকে সাপে কাটে। এ কথা তো তোমরাও জানো। তাই নয় রে কেষ্ট?" লোকটি কোন জবাব দিল না।

মাতব্বর বললেন, "তখন আমার বয়স বছর আট-নয়। সে সব কথা ভুলেই গেচি। তোমায়ও রোজ যদি না দেখতাম তা হলে তোমাকেও প্রথম দেখায় চিনতেই পারতাম না।"

"বেদে বললে, 'আমি এখন যাই।'

"ব্রজ আকুলভাবে বললে, 'বাবা, কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? সবাইকে নিয়ে এসে এখানে থাক্। তোকে যা দিয়ে যাবো তা দিয়ে দু-পুরুষ বসে বসে খাবি। বুড়োর মুখে মরবার আগে একটু জল দিস্।"

"দত্তমাশাই বললেন, 'খুড়ো, ওর কি জাত-ধর্ম আছে যে ওর হাতের জল খেয়ে মরবে?"

"ব্রজ বললে, 'বাপের কাছে ছেলের আবার জাত ধর্ম কি? থাক

বাবা, থেকে যা। তোকে এক ঘড়া মোহড় দেবো—মোগল বাদশার আমলের আশরফি—'

"দত্তমশাই চমকে উঠলেন; বললেন 'বল কি খুড়ো? কোথায় রেখেচ?"

"বেদেও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

ব্রজ বললে,—'যকের মতো তোরই জন্যে আগলে রাখচি।'

বেদে বললে, 'তুমি আমার বাপ। এ সব ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। তোমার কিছু কষ্ট হবে না।'

"ব্রজ বললে, 'বুড়ো বয়সে এই ভিটে ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে কোথায় পথে পথে ঘুরবো? ঘরের বাঁধন কাটাতে পারবো না, বাপ। তুই-ই ছেলে-পুলে নিয়ে এসে বুড়ো বাপের কাছে থাক, ঘরে সংসার পাত। তোর কোন কষ্ট হবে না।'

"বেদে বললে, 'ঘরে থাকতে পারবো না। দম আটকে মরে যাবো।'

'তবুও ব্রজ তাকে ঘরে বেঁধে রাখবার কত চেষ্টা করলে। বাপের চোখের জল, ঘড়াভরা মোহরের লোভ সেই ঘরছাড়াকে আটকাতে পারলে না। সে চলে গেল। যাবার সময়ে বললে, 'তুমি চল। তোমাকে আরামে রাখবো। তোমার নাতি শিকার করে আনবে। বউ তোমার যত্ন করবে। কত দেশ দেখবে, চল—চল।' কিন্তু ছেলেও বুড়ো বাপকে ঘর ছাড়া করতে পারলে না। বুড়োর শুকনো গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"বেদে বললে, 'কাল আবার আসবো। তুমি আমাদের আস্তানায় যেও না।'

“বেদে চলে গেলে হরিদত্ত বললে, ‘খুড়ো, মোহরগুলো কোথায় রেখেচো? ঘরে মাটির তলায়, না পুকুরে?”

“ব্রজ উত্তর দিলে না, উঠে ঘরের দিকে এগোতে লাগলো!

“দত্তও ছাড়েন না! বললেন, ‘বল খুড়ো, সেও তো তোমার পাপের ধন! তোমার ছেলে তো আর নিতে আসবে না। তুমি মলে আমরা পাঁচজনে সৎকাজে ব্যয় করবো! বল—’

‘পাপের ধন ভগবান ছোঁয় না।’

‘আমরা শোধন করে নেবো।’

‘আমি মলে ওই অশ্বত্থ গাছের দক্ষিণ দিকের গোড়া খুঁড়ে দেখো।’

“দত্তমশাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বাড়ি এলেন। তার একটু পরেই আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে নামলো বর্ষা! তারপর তিনদিন তিন রাত কখন প্রবল ধারায়, কখন ক্ষীণধারায় বৃষ্টি হলো। সেই সঙ্গে বাতাসের দমকা। গাছপালা ভেঙ্গে পড়লো। গাঁয়ের খানা ডোবা-পুকুর ভরে উঠলো, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে হাতীডোবার জঙ্গলে জমলো এক হাঁটু জল; ইছামতী লক্ষ লক্ষ হাতে করতালি দিয়ে মহোল্লাসে ছুটে চলতে লাগলো, দিন-রাত হয়ে গেল একাকার! তেমন বর্ষণ কেউ কখন দেখেনি; দেখলেও ভুলে গিয়েছিল।

“তিনদিন পরে বৃষ্টি থামলে মাতব্বর দত্ত কয়েক জনকে নিয়ে গাঁয়ের অবস্থা দেখতে বেরোলেন। সেই সজল, সকরুণ দৃশ্য সত্যিই হৃদয়-বিদারক। তাঁরা জল ভেঙ্গে অতিকষ্টে ব্রজদাসের কুঁড়েতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, তার জীর্ণ পুরোনো দেহ-পিঞ্জরটি জলসিক্ত মেঝেয় পড়ে আছে, তা থেকে প্রাণপাখী গেছে উড়ে।

"সে অবস্থায় থানায় খবর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এক ক্রোশ পথ সেই জলকাদা ভেঙ্গে যাবার মতো উৎসাহী লোকও পাওয়া গেল না। তার ওপর শূন্য হৃদয়, ব্যথিত বৃদ্ধের ওপর কতকটা অনুকম্পা বশেই গাঁয়ের বোষ্টম ডেকে ইছামতীর ধারে তার সৎকারের ব্যবস্থা করা হলো।

তার কুঁড়ে খুঁজে পাওয়া গেল একটি মাটির ভাঁড়ে গুটি তিনেক চাঁদীর টাকা, কয়েক আনা পয়সা ও একখানি চকচকে আশরফি। মাতব্বর দত্তর হেফাজতে তা রইলো। তিনিই সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। এবং আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় অর্ধদগ্ধ শবটি ইছামতীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। শবটি ভাসতে ভাসতে চললো দক্ষিণে।

"খেয়াঘাটে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বেদেরাও বর্ষার প্রথম দিনে খেয়া পার হয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকেই।

"তারপর ব্রজদাসের গুপ্তধনের সন্ধানে কত লোক যে তার ঘরের মেঝে, উঠোন, বাগান ও অশ্বত্থগাছের গোড়া খুঁড়েচে! পুকুরেও ডুব দিয়ে দেখেচে কেউ কেউ। কিন্তু কেউ তার সন্ধান পায়নি। তার হৃদয়ে পুত্রস্নেহের মতোই তা লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল।"

পুরোনো দিনের এই কাহিনীটি শুনে বালক বয়সে আমরাও অনেক সন্ধান করেচি। কিন্তু সে ধন আবিষ্কারের সামর্থ্য কারো হয়নি। ব্রজদাসের হৃদয়ের মতোই জায়গাটি যেন শূন্য!

বেলুনওয়ালা

কড়্ কড়্ শব্দ শুনে সন্তোষ পড়ার ঘর থেকে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো।

এক বেলুনওয়ালা চলেছে। তার হাতে, পিঠে, মাথায় নানা রকমের, নানা রঙের বেলুন। মাথার বেলুনটা পাগড়ির মতো। তা আবার সাপের মতো ফণা তুলে আছে।

ছোট বোন শ্লেট থেকে মুখ তুলে বল্লে, "দাদা দেখ, ওর মাথার বেলুনটা কি সুন্দর! ঠিক যেন মুকুট! ও রাজা সেজেচে! আমিও একটা কিনবো—" বলে সে চেয়ার থেকে নেমে ছুটলো ভেতরে।

বেলুনওয়ালা এসে পড়লো একেবারে ঠিক জানালাটার সামনে। তার বয়স হবে চোদ্দো কি পনেরো বছর। তার বেশি বা কমও হতে পারে—ছোটলোকদের বয়স আন্দাজ করা যায় না! ওরাও তার হিসেব রাখে না। যেমন হয় রুক্ষ মূর্তি, চোয়াল দু'খানা বড়, গাল দু'খানা ভেতরে ঢোকান, মাথার চুলগুলো কুঁচির মতো, চোখ দু'টো ভাবহীন, গায়ে ময়লা গেঞ্জী, পরনে ময়লা কাপড়—হাঁটুর আঙুল কয়েক নিচে অবধি নেমেছে। ওরই মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য, ছেলেটাকে কালো বলা যায় না, কোঁচাটি পেটের সামনে গোঁজা, পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডাল।

সন্তোষ নিজের মনেই হেসে বল্লে, "আরে বাপস্! বেলুনওয়ালা বাবু!"

পিছন থেকে দু'টি ছেলে ছুটে এসে দুটি' বেলুন কিনে নিয়ে ফুটপাতের দিকে চলে গেল।

বেলুনওয়ালা ঝোলা থেকে একটা বেলুন বার করে ফুঁ দিয়ে সেটা ফোলাতেই ফট্ করে গেল ফেটে। সে আবার একটা বার করলে। এবার বার করলে ব্যাগ-পাইপ! থলিটা সাবধানে ফুলিয়ে বাজাতে লাগলো।

সন্তোষ উঠে এসে জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে ছেলেটার বাজনা শুনতে শুনতে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বেলুনওয়ালা তার দিকে পিছন ফিরে বাজাচ্চে আর দু'পাশে মাঝে মাঝে হেল্‌চে। দু'একটি করে ছেলেমেয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরতে লাগলো।

একখানা মালবোঝাই লরি হর্ন দিতে দিতে আস্‌ছিল। বেলুনওয়ালা ফুটপাথে উঠে দাঁড়ালো। তার মুগ্ধ শ্রোতার দলও তার সঙ্গে উঠে এল।

সন্তোষও আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো কিন্তু সুর তাকে আকৃষ্ট করে নি, বেলুনও সে কিনিতে চায় না, ব্যাগ-পাইপের ওপরও তার লোভ নেই। তাকে বাইরে টেনে এনেছে একখানি পুরোনো ছবি। সে একেবারে বেলুনওয়ালার পিছনটিতে এসে দাঁড়িয়েচে।

বেলুনওয়ালার আরও তিনটি বেলুন বিকিয়ে গেল কিন্তু তার ব্যাগ-পাইপের সুরে আকৃষ্ট হলেও তা কেনবার মতো ক্রেতা একজনও পাওয়া গেল না। তবুও সে বাজাতে বাজাতে পিছন ফিরতেই সন্তোষের সঙ্গে তার চোখোচোখি হলো।

সন্তোষ বল্‌লে, "তোমার নাম হরিকিঙ্কর না?"

হয়তো দু'কানে ব্যাগ-পাইপের সুর ভর্তি ছিল বলেই সে প্রথমটা শুনতে পেল না ; তাই উত্তর দিলে না ।

সন্তোষ এবার গলা একটু চড়িয়ে বল্‌লে, "তুমি হরিকিঙ্কর ?"

বেলুনওয়ালা মুখ থেকে ব্যাগ-পাইপের নলটি সরিয়ে নিলে ; তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হলো, রুক্ষ মুখখানা একটু কোমল হয়ে এল। সে বল্‌লে, "হাঁ। কিন্তু....ও হাঁ....চিনতে পেরেচি ।"

সন্তোষ বল্‌লে, "তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েচো ?"

"হাঁ।"

"কতদিন ? কেন ?"

"দু'বছর ।"

"দু—ব—ছ—র ? কেন ছাড়লে ? তুমি তো ফার্স্ট হতে !"

হরিকিঙ্কর মাথা থেকে বেলুনের পাগড়িটা খুলে নিলে, তার ব্যাগ-পাইপের থলিটাও চুপসে এল। সে বিস্ফারিত চোখে সন্তোষের দিকে তাকালো। নধর চেহারা, ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, মাথার চুল ওল্‌টানো, কপালখানা বুদ্ধিদীপ্ত ; গায়ে নীল রঙের হাওয়াই সার্ট, পরনে শাদা পাজামা, পায়ে নীল রঙের স্যাণ্ডাল । হরিকিঙ্কর ব্যাগ-পাইপের নলটা দু' আঙলে টিপতে টিপতে বল্‌লে, "পড়বার খরচ জোগাড় করতে পারলাম না ।"

সন্তোষ বল্‌লে, "এস আমাদের বাড়ি। তোমাদের দোকানখানা ?"

সন্তোষের পিছন পিছন ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে হরিকিঙ্কর বল্‌লে, "দোকান উঠে গেছে। বাবা মারা গেলেন। আমি চালাতে পারলাম না—"

সন্তোষের মনে পড়লো, তারা তখন থাকতো বারাকপুর ট্রাংক রোডে। তাদের মস্ত বাড়ি, চারধারে বাগান, সামনে পুকুর। সেখান থেকে স্কুল ছিল সিকি মাইল দূরে। হরিকিঙ্কর থাকতো রেল গুমটির ওধারে একখানি টিনের চালায়। তার সামনে একটি পান-বিড়ি-চায়ের দোকান। দোকানের সামনে দিয়ে চলে গেছে রাস্তা সেই একেবারে আধ ক্রোশটাক দূরে—ঝিলের ধারে। দোকানখানা ছিল হরিকিঙ্করের বাবার। ঝিলটার শেষ দিকে মস্ত কাপড়ের কল। ট্রেনের যাত্রীরা যাবার-আসবার পথে ঐ দোকানে পান-বিড়ি কিনতো—কেউ কেউ দোকানের সামনে ঝাঁপের তলায় পাতা বেঞ্চিতে বা প্যাকিং বাক্সটার ওপর বসে কাচের গেলাসে করে চা খেত। দোকানের পিছন দিকে ছিল একটা জলে ভরা প্রকাণ্ড খাদ। খাদের পর কুশ ও কাশ ঘাসে ঢাকা মাঠ, মাঠের পর মাঠ। তারপর থেকে শুরু হয়েছে গাঁ। রাস্তার দু'পাশে মাঠ ও ফাঁকা ফাঁকা খান কয়েক একতলা পাকা বাড়ি। কোন কোনটা তখনও তৈরী হচ্ছিল। এই সব মাঠ ও খাদ বর্ষায় যেত জলে ডুবে। এধার-ওধার থেকে ছেলে-বুড়ো ছিপ হাতে আসতো মাছ ধরতে। শরতে খাদে ডোবায় খালে ফুটতো অজস্র শালুক, মাঠে মাঠে উড়তো কাশ-ফুলের অসংখ্য শাদা নিশান। সন্তোষ ক'দিন বেড়াতে গেচে এই দিকে! হরিকিঙ্করের বাবার দোকান থেকে পান খেয়েচে, চা-ও খয়েচে। কিন্তু তার বাড়ির কেউ তা জনে না। সে জানতে দেয় নি। হরিকিঙ্কর ছিল তাদের ক্লাসের "ফার্স্ট বয়।"

সন্তোষ বললে, "বোস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

হরিকিঙ্কর সমস্ত ঘরখানাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। চেয়ারে

বসতে তার সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো। তার পোশাক, পেশা ও চেহারা সে ঘরে একদম বেমানান।

সন্তোষ আবার বল্‌লে, "বোস বোস।"

হরিকিঙ্কর চেয়ারের ধারটিতে ভর দিয়ে সন্তর্পণে বসলো। তারপর আপনা থেকেই বল্‌লে, "ফ্রি স্টুডেণ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু থাকবার-খাবার জায়গা পেলাম না। ঘরখানা ঝড়ে পড়ে গেল—"

"তোমার বোন ছিল না?"

"তারাই গরীব তো আমায় খেতে-পরতে দেবে কোত্থেকে?"

"বেলুন বিক্রি করে পড় না?"

হরিকিঙ্কর নিঃশব্দে হাসলে। সন্তোষের মনে হলো সেটা হাসি নয়, চাপা কান্না!

হরিকিঙ্করের চোখ পড়লো দরজায়। একটি সুন্দর মেয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে অবাক হয়ে দেখচে। তার এক হাতে একটি আনি।

হরিকিঙ্কর লাল রঙের বেলুনটা গোছা থেকে খুলে নেবার আগেই মেয়েটি ছুটে ভেতরে চলে গেল।

সন্তোষ বল্‌লে, "ওখানে কারুর বাড়িতে থাকতে পেলে না?"

"এটা কে? কার সঙ্গে গল্প করচো?"

সন্তোষ ও হরিকিঙ্কর দু'জনেই মোটা গলার শব্দে চমকে উঠলো।

হরিকিঙ্কর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার বেশি করে মনে পড়লো, সে যে বেলুনওয়ালা। তার জায়গা হলো উন্মুক্ত রাজপথ। সে অপরাধীর মতো বক্তার বিশাল দেহের পাশ দিয়ে

বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই তিনি আবার বল্‌লেন, "এর সঙ্গে গল্প করচো কেন? কেন যাকে-তাকে ঘরে ঢুকিয়ে একেবারে চেয়ারে বসিয়েচো?"

হরিকিঙ্কর বেরিয়ে যেতে যেতে দেখলে বক্তার পাশে সেই সুন্দর মেয়েটি, মাথার কালো কোঁকড়ান চুলের কতকগুলো গালের দু'পাশে পড়েচে, কিন্তু তার চোখে আর অবাক চাহনি নেই।

সে শুনতে পেল সন্তোষ বলচে, "ও আমাদের সঙ্গে পড়তো।"

"পড়তো তো হয়েচে কি? আজ বাদে কাল তোমার পরীক্ষা! পাশ করে তোমায় বিলেত যেতে হবে......"

হরিকিঙ্করের হাত থেকে লাল রঙের বেলুনটা হঠাৎ উড়ে গেল। সে আর দাঁড়ালো না, কোনদিকে তাকালোও না, সোজা পথ দিয়ে চলতে লাগলো মোড়ের দিকে।

তারপর বেলা তখন সাড়ে দশটা। সন্তোষ স্কুলে যাবার পথে দেখলে, পার্কের ধারে, গাছতলায় লোহার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হরিকিঙ্কর। তার মুখের সামনে ব্যাগপাইপের নল, মাথায় বেলুনের পাগড়ি, কাঁধের দু'পাশে উড়ছে লাল-নীল-বেগুনি রঙের বেলুন। সে সন্তোষের দিকে তাকালো। কিন্তু মনে হলো, সন্তোষকে যেন সে মোটেই চেনে না। সন্তোষ গাড়ি থেকে মুখ বাড়াতেই সে নলে ফুঁ দিয়ে বাজাতে শুরু করলো। সে সুর সন্তোষের কানে পৌঁছলো না, তার আগেই তার গাড়িখানি মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে পথ চল্‌তি জনতার কেউ কেউ শুনতে পেল বটে!

কালীমোহন ও হরিমোহন

দুই ভাই নয়, বন্ধুও নয়, দুটি যাত্রী মাত্র। কালীমোহন যাচ্ছিল বাড়ি, হরিমোহনের গন্তব্য স্থান মামার বাড়ি।

পথের প্রথম দিকটা রেলে, মাঝখানটা স্টীমারে, শেষ দিকটা পার হতে হয় নৌকোয়। তারপর যেটুকু বাকী থাকে সেটুকু গোযান বা চরণযানের পথ।

দুজনেই অনেক দিন পরে ও অনেক দূরের পথে আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলেছে। সেজন্যে সঙ্গে পরের ফরমাজ্ ও নিজের পছন্দ মতো জিনিষ ছিল অনেক। রেলগাড়িতে চেকারও দুজনের কাছ থেকেই 'আক্কেল সেলামী' আদায় করেছে মোটা রকমের। ওজনে কালীমোহনের মাল-পত্র হয়েছে তিন মণ সাড়ে সাতসের! হরিমোহনের হয়েছে চার মণ পনেরো সের তিন ছটাক। লোকটি নিতান্ত ভদ্র। সেজন্য কালীর রসগোল্লাভরা হাঁড়ি এবং হরির কলাপাঁউরুটি ও মাখনের পুঁটলি ওজনে ধরে নি।

কালীমোহন ও হরিমোহন দুজনেই চেকার সাহেবকে ইংরেজীতে বোঝাবার চেষ্টা করলে—"তারা 'পুওর'; সেইজন্যে এই বোঝা ঘাড়ে করে এমন দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করেছে।" এমন কি, সাহেবকে রসগোল্লা ও কলাও দেখালে; কিন্তু লোকটি নিতান্ত সৎ। তাদের কথায় ও খাদ্যে না ভুলে দ্বিগুণ মাশুল আদায় করে, দুজনকে

তুখানি রসিদ দিয়ে পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই শিষ্ দিতে দিতে নেমে গেল।

তারপর তুজনেই চুপ্‌চাপ্; কিন্তু তখন থেকেই তুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হলো। এক যাত্রায়, একই জনের হাতে, ঠিক এক রকম তুঃখ তুজনকেই ভোগ করতে হয়েছে। তারই ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠ্‌লো। গাড়ি ছাড়তেই জানালা দিয়ে প্ল্যাটফরমটা একবার চকিতে দেখে নিয়ে তুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—"র‍্যাস্‌ক্যাল! উঃ! কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার!"

ক্রমে একথায় সেকথায় কালী জান্‌তে পারলে হরি যাচ্ছে তার মামার বাড়ি, পাশের গ্রামে তুর্গাপুরে; আর, হরি জেনে নিলে, কালীর লক্ষ্য মহেশতলা; তার মামার বাড়ি থেকে পাকা তু' ক্রোশ।

গাড়ি চলেছে; মাঝে কয়েকটা স্টেশনে একটু একটু করে দেরী হয়ে গেল অনেক এবং যখন শেষ স্টেশনে গিয়ে তারা পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয় আর কি।

গাড়ি তাদের নামিয়ে দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলে গেল। কিন্তু স্টীমারের আর দেখা নেই।

বর্ষা কাল। নদী ফুলে, ফেঁপে, তুকূল ভাসিয়ে করতালি দিয়ে নেচে চলেছে। ছোট স্টীমার স্টেশনটি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কূলের একপাশে সরে রয়েছে। নদীর খেয়ালে আবার কখন কোথায় কতদূরে সরে যেতে হয় ঠিক কি? স্টেশনে লোকজন বেশি নেই। বুড়ো স্টেশন-মাস্টারমশাই চোখে চশমা এঁটে প্রকাণ্ড একখানা খাতায় টিকিট ও মালের হিসেব লিখছিলেন।

দুই মোহন বাইরে মালপত্র নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে বল্‌লে—
"নমস্কার, মাস্টারমশাই! স্টীমার কি আজ লেট?"

"না, গাড়িই লেট। স্টীমার চলে গেছে—"

"চলে গেছে?"

"হাঁ। ঐ পূব দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখনও তার ধোঁয়া দেখ্‌তে পাবেন—"

কিন্তু তারা দুজনে সেদিকে না তাকিয়েই চোখে ধোঁয়া দেখ্‌তে লাগ্‌লো। এখন উপায়? সারারাতের মধ্যে তো আর যাবার স্টীমার পাওয়া যাবে না। তার ওপর এখানেই বা থাক্‌বে কোথায়? ওদিকে গ্রামের ঘাটে লোক আস্‌বে, হয়তো গরুর গাড়িও থাক্‌বে। সব যে গোলমাল হয়ে গেল!

এ অঞ্চলটা কালীর চেনা। সে অন্ততঃ পাঁচবার এপথে যাতায়াত করেছে; বল্‌লে—"তার আর ভাবনা কি? আসুন একখানা পানসী ভাড়া করা যাক্‌। এ বরং ভালই হলো। একেবারে গ্রামের ঘাটেই গিয়ে নামা যাবে; প্রথমে আপনি, তারপর আমি—"

হরি এদিকে সেই ছোট বেলায় দুবার এসেছিল; স্বপ্নের মতো সব কথা তার মনে পড়ে; বললে—"বেশ। তবে কিনা বর্ষাকাল—"

কালী সাহস দিয়ে বল্‌লে—"সে সব ভয় নেই, এক ভয় ঝড়-বাদলের। তা' আজকের আকাশের অবস্থা মোটের ওপর ভাল—"

সত্যিই আকাশ তখন একটু পরিষ্কার; কিন্তু পূব দিকটায় এক রাশ কাল মেঘ জড় হয়ে আছে। আর, ওদিক থেকে বাতাসও আস্‌ছে কেমন এলোমেলো ও ঠাণ্ডা।

মাঝে মাঝে দু একখানি নৌকো কূল ঘেঁষে যাওয়া-আসা করছিল। সেগুলোর কোনোটিই পানসী নয়—বজ্‌রা বা জেলে ডিঙী।

এদিকে সূর্য ডুবে গেল। অসময়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হরিমোহন বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো, কালীমোহনের জেদ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু সে অবস্থায় জেদ, বিরক্তি, ক্রোধ বা তেজস্বিতা কোনই কাজের নয়। নৌকো না থাক্‌লে পাওয়া যাবে কোথায় ?

অবশ্য তাই বলে, তারা একেবারে বিফল মনোরথ হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানি পানসী পাওয়া গেল। মাঝি বললে—"নিয়ে যেতে পারি ; কিন্তু ভাড়া লাগবে বেশি।"

হরিমোহনের চেয়ে কালীমোহন চালাক। সে মাঝির কথাতেই রাজী হয়ে মালপত্র ও হরিমোহনকে নিয়ে নৌকোয় উঠ্‌তে উঠ্‌তে মনে মনে বল্‌লে—"একবার গ্রামের ঘাটে পৌঁছই ; তারপর তোমায় বেশি ভাড়া নেওয়াব !"

মাঝির মনের কথা কি ছিল জানি না ; কেননা ছোটলোকের মনের খবর কে রাখে ?

পান্‌সী চলেছে, কূল ধরে স্রোতের টানে। হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল, সে ছইয়ের ওপর বসে শোভা দেখে। কিন্তু ওদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পূব দিকে যে মেঘ জমা হয়ে ছিল, তাও অন্ধকারে অন্ধকারে চোরের মতো চুপে চুপে এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে। সজল বাতাস দূরের গ্রামের ওপর দিয়ে উল্লাসে ধেয়ে এল, সেই সঙ্গে নদী উঠ্‌লো নেচে। মোহনদের মনে হলো, সে যেন হাততালি দিয়ে অট্টহাস্য করছে। তাতে দুজনেরই বুকের ভেতর দুলে উঠ্‌লো।

কালীমোহন বল্‌লে—"মাঝি, আর এগিয়ে দরকার নেই—"

মাঝি বল্‌লে—"না এগোলে রক্ষা আছে ? কাল রাতে ঠিক এই জায়গায় ভয়ানক এক ডাকতি হয়ে গেছে—"

কথাটা শুনেই কালীমোহন কোমরে হাত দিয়ে দেখ্‌লে। তার নোটগুলো ঠিক আছে কিন্তু—। হরিমোহনও পেটের কাছটা একবার ঢুকে নিলে ; তার মামীমার দশ ভরি সোনার হার গাছটা ছোট মামা নতুন গড়িয়ে তার হাতে দিয়ে পাঠাচ্ছেন। ডাকাত ! সে মাঝিকে বল্‌লে—"বাপু, ডাকাতি হয়েছে তুমি কি করে জান্‌লে ?"

"বাবু, তখন আমরা যে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—"

"ব্যাপারটা কি হলো ?"

"ঠিক কি হলো তা আমরাও দেখি নি। তবে শুনলাম—চীৎকার করছে—'ওগো বাঁচাও। আর একজন বলছে—'আমাদের প্রাণে মের না, যা আছে নিয়ে যাও—'

"সে নৌকোর মাঝিরা ?"

"সে নৌকোখানাই যে ডাকাতের নৌকো—"

"কি রকম ?"

"রকম আর কি ? তা আপনাদের কাছে টাকা-কড়ি নেই তো ?"

কালীমোহন অন্ধকারে একবার কোমরে হাত দিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্‌লে—"হেঁ-হেঁ টাকা কোথায় পাব ?"

"তবে আমার ভাড়া দেবে কি করে ?"

"বাড়ি পৌঁছে—"

মাঝি আর কোন কথা বল্‌লে না ; কিন্তু কালীমোহন ও হরিমোহ মনে হলো, সে যেন নাকি সুরে ইসারায় একজন মাল্লাকে কি বল্‌লে।

মাল্লা হুঁকোটা তার হাতে দিতে দিতে বল্‌লে—"কাট।"

উত্তরটা শুনেই কালীমোহনের ও হরিমোহনের হাত-পা ঠাণ্ডা এল। কালীমোহন ঢোক গিলে হরিমোহনকে ইংরেজীতে বল্‌লে "এরা ডাকাত নয়তো ?"

হরিমোহন মনের ভয় গোপন করে ইংরেজীতে জিগ্যেস করলে "আপনার সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে না কি ?

"না। আপনার সঙ্গে ?"

"কিছু না।"

"তবে আর ভয় কি ?" তারপর মাঝিকে বল্‌লে—"মহেশ-তল পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?"

"কাল ভোর—"

"বল কি ?"

তার কথা শেষ হতে হতেই বার কয়েক বিদ্যুৎ চমকে ঝম ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নাম্‌লো। সেই সময় বিদ্যুতের আলোয় একবার দেখা গেল, কিছুদূরে ঠিক তাদের পিছনে একখানা নৌকো আসছে।

মাঝি বল্‌লে—"বাবুরা, ছইয়ের নিচে চুপ করে বস। নড়া-চড়া কোর না, একটা কথাও বলো না। তাহলেই প্রাণ যাবে—" অন্য কোন রকমে যাবার আগে কালীমোহন ও হরিমোহনের প্রাণ তখন আপনা থেকেই গলায় এসে ঠেকেছে। পিছনে ডাকাত, মাথার ওপর ঝড়-বৃষ্টি ! কোথায় রইলো মহেশতলা আর কোথায় বা সেই দুর্গাপুর।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখ্‌তে পায় না। কালীমোহন বল্‌লে—"উপায় ?"

হরিমোহর কেবল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লে।

এদিকে বৃষ্টিতে নৌকোর তলা জলে ভরে উঠ্‌লো। তার গতিও শিথিল হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা লাগ্‌ছে। দুজনের জামা-কাপড় ভিজে গেল। তাদের জিনিষ-পত্রের অবস্থা তাদের চেয়েও খারাপ। সেগুলো ছিল পাটাতনের ওপর। নদীর জলে ও বৃষ্টিতে সেগুলোর ওজন কিছু না হলেও অন্ততঃ আধমণ করে বেড়েছে।

এমন সময় একেবারে ঠিক পাশ থেকে বিশ্রী মোটা ও কর্কশ গলায় হাঁক শোনা গেল—"নৌকো কোথায় যাবে ?"

কালীমোহনদের মাঝি কি একটা উত্তর দিলে—কিন্তু বোঝা গেল না। তাদের দুজনের হাত-পা তখন অসাড় !

কিছুক্ষণ কেটে গেল। চারধারে গাঢ় অন্ধকার, সন্‌ সন্‌ শব্দে বাতাস বইছে। কিন্তু বৃষ্টির বেগ কিছু কম, নদীর কল্লোলও যেন আর তেমন নেই।

হরিমোহন বললে—"কালীবাবু, কি ব্যাপার বলুন তো ?"

"বুঝ্‌তে পারছি না। ঐ দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না ?"

"তাই তো—"

হঠাৎ মাঝি বল্‌লে—"বাবুরা, ঘুমোলে ?"

"না। কেন ?"

"যদি কিছু হয় আমাদের দোষ দিও না। আমাদের পিছনে দুখানা

নৌকা ধাওয়া করেছে। সেজন্যে এই খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। যদি বেঁচে যাও, আমাদের বকশিষ দিতে হবে।"

দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—"দেব, নিশ্চয়ই দেব।" তারপর হরিমোহন বল্‌লে—"আমার মামা,—দারোগা—"

কালীমোহন বল্‌লে—"আমার কাকা নায়েব—"

কিন্তু তাদের কথা শেষ না হতেই পিছনে হাঁক শোনা গেল, তার উত্তর এল সামনে থেকে। শব্দটা জলের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বহুদূরে বোধহয় তটসীমায় মিলিয়ে গেল।

কালীমোহন বল্‌লেন—"হরি বাবু, বিদায়—"

হরিমোহন বল্‌লে—"বিদায় দিয়ে লাভ কি? দুজনকেই এক সঙ্গে পরলোকে যেতে হবে। আমরা আর-জন্মে বন্ধু ছিলাম কালীবাবু।" বল্‌তে বল্‌তে তার গলা ধরে এল। "এর চেয়ে যে স্টীমার ঘাট ছিল ঢের ভাল।"

নৌকো এমনই স্রোতের টানে ছুটে চলেছে; তার ওপর মাল্লারা দাঁড় ধরলে, নৌকো আরও জোরে যেতে লাগ্‌লো।

হরিমোহন বল্‌লে—"মাঝি, বাঁচাও—"

মাঝি বল্‌লে—"এখন আল্লা যা করে। আপনারা এমন লোকের ছেলে—"

কিন্তু বেশি দূর যেতে হলো না; পিছনের নৌকো দুখানা তাদের দুপাশে এসে লাগ্‌লো; সেই সঙ্গে কে যেন মোটা গোলায় বল্‌লে—"বাঁধ্‌ সকলকে! দেখিস্‌ যেন জলে ঝাঁপ দিয়ে না পালায়—"

তার কথা শেষ হতে হতেই যমদূতের মতো চার পাঁচজন লোক

এসে হরিমোহনদের নৌকোয় উঠে বল্‌লে—"কেউ যদি এক চুল নড়িস্ তো কেটে ফেল্‌ব।"

মাঝি বল্‌লে—"আমরা গরীব মানুষ। নৌকো বেয়ে খাই।"

"নৌকোর মধ্যে মেয়েছেলের কন্নার শব্দ শুন্‌ছি না ?"

একজন বল্‌লে—"চল না গিয়া দেখি। ওরে মেঘা মঝিটাকে বাঁধ্।"

মাঝি বল্‌লে—"দোহাই তোমাদের। আমরা গরিব। ছইয়ের নিচে মেয়েছেলে নেই। দুজন বাবু আছে ; তারাই ভয়ে কাঁদ্‌ছে—"

ওদিকে হরিমোহন কেঁদে উঠ্‌লেও কালীমোহন তাকে সাহস দিয়ে বল্‌লে—"যদি মরতেই হয় তো বীরের মতো মরবো। নৌকোয় উঠ্‌বার সময় দেখেছিলাম, ছইয়ের কাছে মাঝিদের একখানা দা আছে। এই যে হাতে ঠেক্‌ছে। মরবার আগে ওদের দু'চারজনকে ঘায়েল না করে—"

তার কথাও শেষ হলো না, টর্চের তীব্র আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল ; সেই সঙ্গে টর্চধারী বলে উঠ্‌লো—"ওরে বোদে, হাতে কাটারি নিয়ে বসে আছে—"

অমনি বাইরে থেকে হাঁক উঠ্‌লো—"ধর্ ধর্—"

কালীমোহন বল্‌লে—"যদি কাছে কেউ আস তো এই কাটারি দিয়ে—"

টর্চধারীর পাশ থেকে একজন অমনি বলে উঠ্‌ল—"দেখ্‌ছ আমার হাতে কি ?"

হরিমোহন ও কালীমোহন সেদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে

বসে রইলো, আর চোখ ফেরাতে পারলে না। মনে হলো, তাদের সামনে পরলোকের একটি সরু সুড়ঙ্গ হাঁ করে আছে। একটু নড়লেই ওর ভেতর থেকে একটা ক্ষুদ্র যমদূত বেরিয়ে তাদের পরলোকে টেনে নিয়ে যাবে! লোকটা বল্‌লে—"হাতের কাটারি ফেল্।"

কালীমোহন কাটারি ফেলে দিলে। লোকগুলো এসে তাদের হাত বেঁধে জিগ্যেস করলে—"সঙ্গে কি আছে?"

এবার বীর কালীমোহন কেঁদে ফেল্‌লে। হরিমোহনের চোখের পাতা আগে থেকেই ভিজে ছিল; তাদের কথায় আরও ভিজে উঠ্‌লো। তারা উত্তর দিলে না, নীরবে কাঁদতে লাগল।

"কি? উত্তর দিচ্ছে না যে?—কোথায় যাবে?"

হরিমোহন বল্‌লে—"মহেশতলা"

কালীমোহন বললে—"না, না; উনি যাবেন দুর্গাপুর—"

"বটে!"

হরিমোহন এবার ঘাড় নেড়ে বললে—"হঁা—"

"তবে যে বল্‌ছিলে মহেশতলা?"

"ভুলে—"

"বটে। চালাকী হচ্ছে? আচ্ছা, চল আড্ডায়, তুমি বুঝি ওর সঙ্গী?"

"সঙ্গী মানে আমি ওকে আগে চিনতাম না, পথে আলাপ। যাচ্ছি মহেশতলা—"

"হুঁ। সঙ্গে কি আছে?"

"সংগে?"

"হাঁ—হাঁ—সংগে—"

"কিছু না—"

নৌকো কিন্তু সমানে চলেছে। পাশের নৌকো থেকে সেই মোটা গলা হাঁকলে—"পেলে কিছু ?"

"হাঁ"—বল্তে বল্তে কালীমোহনদের নৌকোয় যারা ছিল তাদের দুজন এসে হরিমোহনদের পকেট হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে ট্যাঁকে হাত দিয়েই বলে উঠ্‌ল—"এই যে—"

তারপর নোটের তাড়া ও হারগাছটি বার করে টর্চের আলোয় ধরে বল্‌লে—"আমাদের চোখে ধূলো চাঁদ ? নৌকোর চাল-চলন দেখেই বুঝেছিলাম। এবার চল—"

"দোহাই তোমাদের ! এবার ছেড়ে দাও—আর কিছু নেই—"

"দেখা যাক্—" বলে তারা তন্ন তন্ন কোরে দুজনের শরীর তল্লাস করলে। তারপর বল্‌লে—"নৌকোয় হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু এই অন্ধকারে—"

তাদের একজন হারগাছটি ও নোটের তাড়া নিয়ে পাশের নৌকোয় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মোটা গলা হাঁকলে—"নৌকোখানা কলা-বাগানে নিয়ে চল্। আর, লোক দুটোকে আমার কাছে নিয়ে আয়—"

তারা কালীমোহন ও হরিমোহনকে দু'টো গুতো দিয়ে বললে—"ওঠ্—"

"ওরে আমিই যাচ্ছি, আন্‌তে হবে না"—বল্‌তে বল্‌তে সেই মোটা গলা ও-নৌকো থেকে মোহনদের নৌকোয় এসে টর্চ ফেলেই বলে উঠ্‌লো—"কে ? হরে ?"

অনেকক্ষণ থেকে হরিমোহনের সন্দেহ হচ্ছিল; এবার আর সন্দেহ রইলো না, কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—"বড় মামা!"

মামা চালাক লোক। নিমেষে বুঝ্‌লেন, মস্ত একটা ভুল হয়েছে। তাঁরা গতকালের ডাকাতির কিনারা করতে বেরিয়েছিলেন। শেষে ডাকাত-ভ্রমে নিজের ভাগ্নে ও তার বন্ধুকে ধরে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"ভয় পেয়েছিস্? কাঁদিস্ না। চল্, ঐ নৌকোয়—"

* * *

হরিমোহন চোখের জল মুছে মামার সঙ্গে যাবার চেষ্টা করতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে দেখে কালীমোহন তাকে ঠেল্‌ছে—আর বলছে, "হরিবাবু উঠুন, ভোর হয়ে এল; ঘাটে পৌঁছলাম—"

এক প্যাকেট লজেন্‌সে

"এক আনায় এক প্যাকেট। একটা গালে দিলে এক ঘণ্টা থাকে। নেবেন স্যার? নিন না। ভাল লজেনস্। একটাতে আধসের জলের কাজ করবে।"

বললুম, "লজেনস্ খাই না।"

পরনে ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছেঁড়া ময়লা হাতকাটা শার্ট ছেলেটির; উত্তর দিলে, "স্যার, বাড়িতে তো খোকাখুকু আছে। তাদের জন্যে নিয়ে যান।"

"কিন্তু একটা লজেনস্ একঘণ্টা গালে রাখবার মতো খোকাখুকু বাড়িতে তো নেই বাপু। একটির বয়স পাঁচ মাস। তার গালে দিলে আধ মিনিটেই গলায় গিয়ে অক্কা পাবে। আর একটির বয়স ষোলো বছর মানে উঠতি গুণ্ডা। হাড়-গোড় চিবতেই তার আনন্দ। কাজেই কিনে কি করবো?"

সামনের বেঞ্চিতে খাকি প্যাণ্ট-শার্ট পরা ছিমছাম চেহারার একজন বসে সিগারেট টানছিলেন; তিনি একটু হাসলেন, হয়তো আমার উত্তর শুনে।

ছেলেটি কাতর ভাবে কতকটা স্বগত বললে, "আজ ইস্কুলের ছুটি। তাই বেশি বেচতে পারলাম না। প্যাসেন্‌জারও কম—"

ভদ্রলোকটি বললেন, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

ট্রেন তখন মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটছিল। মাঠপারে গ্রামের দিকে হাত দেখিয়ে ছেলেটি বললে, "ঐ গাঁয়ে।"

"ঐ গাঁয়ে ?" প্রশ্নকর্তার বিস্ময় ও কৌতূহল জেগে উঠলো; বললেন, "কৈখালা গাঁয়ে তোমার বাড়ি ? তারক দত্তকে চেনো ? সেই যিনি একটা বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিলেন ?"

ছেলেটি কোন উত্তর না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

আমারও কেমন কৌতূহল জাগলো; বললুম, "বাঘের বাচ্চা ? কোত্থেকে ধরে এনেছিলেন ? লোকটি শিকারী ছিল নিশ্চয় ?"

ভদ্রলোক আমার কথায় কান না দিয়ে ছেলেটিকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, "তাদের চেনো ?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বললে, "চিনি। তিনি মারা গেছেন।" বলে কামরাটার একেবারে শেষ দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "দেবো দাদা ?"

ভদ্রলোকটি আবার বললেন, "কবে মারা গেছেন ?"

"সাত বছর হলো।"

"সাত বছর ? বটে! আচ্ছা, তাঁর এক ভাগ্নে ছিল না ?"

"হুঁ।"

"সে কোথায় জান ?"

"আমিই সেই।"

"তুমি ? —তারক দত্তের ভাগ্নে রেলগাড়িতে লজেনস্ বেচ্ছো ? তোমার মা-বাবা কোথায় ?"

"বাবা নেই। মা বাড়িতে আছে।"

এবার আমারও মনে পড়লো কৈখালা গাঁয়ের তারক দত্তর কথা।

বছর আষ্টেক আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামেশ্বরের এক ধর্মশালায়। মনে পড়ছে যেন একটি ছেলেও তাঁর সঙ্গে ছিল। আর ছিল তার মা ও মামী। বললুম, "তোমার নাম কি বল তো?"

"প্রদোৎকুমার সরকার।"

"প্র-দ্যো-ৎ কু-মা-র! হবে। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, তুমি রামেশ্বরের সমুদ্রের ঢেউয়ের টানে জলে ভেসে যাচ্ছিলে?"

ছেলেটি এবার আমার মুখের দিকে যেন ভাল করে তাকিয়ে দেখলে; তারপর একটু হেসে বললে, "হ্যাঁ। আপনাকেও চিনতে পেরেছি।" বলে নমস্কার করলে।

বললুম, "কিন্তু বাপু তুমি অনেকটা বদলে গেছ। তা পড়াশুনো ছেড়ে এ কাজ কেন করছো বল তো? তোমার মামার তো ছেলে-পুলে ছিল না, বিষয়-আশয়ও যথেষ্ট ছিল। তোমাকে খুব আদর-যত্নেই রাখতেন তিনি।"

ভদ্রলোকটি বললেন, "আমিও তো তাই ভাবছি।"

প্রদ্যোৎ বললে, "এখন আমরা খুব গরিব। মামা-মামী কেউ নেই। মামা—"বলে সে ঢোক গিললে।

ভদ্রলোকটি জিগ্যেস করলেন, "কি হয়েছিল তাঁর?" বলতে বলতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

"যে বাঘের বাচ্চাটা পুষেছিলেন সেটা একদিন রেগে উঠে তাঁকে কামড়ায়। মামী ছাড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁকেও কামড়েছিল। মামা তবুও বাঘটার গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু দুজনের গায়ের সেই কামড়ের ঘা পচে গিয়ে মারা যান।"

"কিন্তু তাঁর বিষয়-আশয় ?"

"জানি নে।"

"আমাকে চিনতে পারছো ? বেশ ভাল করে দেখ তো ? চিন্‌তে পারছো না ?"

এমন সময়ে গাড়ি এসে স্টেশনে থামলো।

প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নামবার উদ্যোগ করতেই ভদ্রলোকটি প্ল্যাটফরমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ঐ তো তারক দত্ত—হ্যাঁ তিনিই—"

ততক্ষণে ছেলেটি নেমে পড়েছে।

আমিও দেখলুম এবং অনেক দিন পরে হলেও দেখেই চিনলুম, তারক দত্তই বটে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে ডাকলুম, "দত্তমশাই—ও দত্তমশাই—"

দত্তমশাই ফিরে তাকিয়ে বললেন, "আমায় ডাকছেন ?"

"হ্যাঁ আপনাকেই। আপনি তারক দত্তমশাই নয় ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ?"

"সেই রামেশ্বরের ধর্মশালায়—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ মনে পড়েছে—তা এদিকে যে ? কতকাল পরে দেখা হলো। আপনাদের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আজ আর ছাড়ছি নে। গরিবের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতেই হবে। নামুন—নামুন। সঙ্গে জিনিষ-পত্তর কি আছে ?" বলে আমার হাত ধরে একরকম টেনে নামালেন।

বললুম, "ফিরতি পথে হবে—যাচ্ছি পরের স্টেশনে—"

"আচ্ছা, আমি সেখানে যাবার ব্যবস্থা করে দেবো। আমাদের গাঁ থেকে ওদিকে যাবার পাকা সড়ক আছে। মনে পড়ছে, বলেছিলেন, আমার বাড়ি একদিন যাবেন?"

ওদিকে ততক্ষণে সেই ভদ্রলোকটিও নেমে শ্রীমান প্রদ্যোতের হাত ধরে টানতে টানতে দত্তমশায়ের সামনে তাকে এনে বললেন, "এই নিন্ আপনার ভাগ্নে।"

"আমার ভাগ্নে? আপনি? ওহো! প্রফুল্ল? তুমি? কোথা থেকে? এ কি ব্যাপার?"

"প্রথম ব্যাপার আপনার ভাগ্নেকে ধরে এনেছি। দ্বিতীয় ব্যাপার আমার খবর পরে দেবো। এই দেখুন, এর প্যাণ্টের পকেট থেকে বেরিয়েছে এই মনি ব্যাগটি—"

ব্যাগটি দেখে চমকে উঠলুম; বললুম, "ওটা যে আমার ব্যাগ। কি হাতসাফাই! কখন নিলে?"

"তাই যদি ধরা যাবে তবে লোকের পকেট মারা যায় কেন?"

ব্যাগ খুলে দেখলুম; টিকিট ও টাকা তখনও ঠিকই আছে।

ছোট স্টেশন। গাড়িখানি চলে গেল। কিন্তু আমাদের ঘিরে ধরলে একটি ছোট জনতা। বললুম, "এর শাস্তি কি?"

ভদ্রলোকটি বললেন, "স্টেশন মাস্টারের হাতে দেওয়া। কারণ পুলিশ তো ত্রিসীমানায় দেখছি নে—"

তারকবাবু বললেন, "ওরা তো একা থাকে না। সঙ্গীটঙ্গী গেল কোথায়? থাকলে কি ও হাতেনাতে ধরা পড়ে?"

ভদ্রলোকটি বললেন, "অন্য হাতে মাল পার করবার আগেই যে

বাছাধনকে ধরেছি। এই! কত দিন এ কাজ করছিস্ ?" বলে তিনি তাকে বেশ জোরে নাড়া দিলেন।

সে বললে, "আমি পকেট থেকে তুলে নিই নি। গাড়ির মেজেয় ওটা পড়ে ছিল। আমি গরিব বলে আমাকে আপনারা মারছেন—" বলেই কেঁদে ফেললে।

বললুম, "বাপু হে কাঁদছো তো! কিন্তু দত্তমশায়ের ভাগ্নে বলে যেমন নিজের পরিচয় দিয়েছো তেমন সত্যি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া আর কান্নাও কি ?"

এমন সময়ে ভীড়ের ভেতর থেকে একেবারে মাঝখানে সরে এল চুল ওল্টানো, হাত কাটা শার্ট ও দোনলা মানে পাজামা পরা একটি প্রিয়দর্শন যুবক। সে এসেই রুক্ষস্বরে বললে, "এই! তোর বাড়ি কোথায় ? বল্, শূয়ার কা বাচ্চা!" বলেই টপ্ করে তার পিঠে মারলে এক চড়। তারপর সকলের ওপর দিয়েই একবার চোখে বুলিয়ে নিয়ে আবার বললে, "একগাছা কলার ডেগো দিতে পারেন ? চড়-চাপড়ে কিছু হবে না, ডেগো-পেটা করলে বাছাধন বুঝতে পারবে পকেটমারার কি শাস্তি। বদমায়েশ!"

একটি ছোকরা বলে উঠলো, "ডেগো কাটতে গেলে পরের ঝাড়ে যেতে হবে। তার-চেয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে ঐ মানকচুর ডালে কাজটা সারা যায় না ?" বলেই সে হেসে উঠ্‌লো।

দোনলাপরা বললে, "ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

দত্তমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি দলের নাকি ?"

সে চোখ রাঙা করে বললে, "কি বলছেন ? আমি পকেটমারের—"

"দোস্ত্, ভাগো।" বলে দত্তমশাই এমন মূর্তিতে তাকে ধমক দিলেন যে, সে বাস্তবিকই সরে গেল। দত্তমশাই বললেন, "একে ছাড়া হবে না। চলুন স্টেশন মাস্টারের ঘরে নিয়ে যাওয়া যাক্।"

স্টেশন মাস্টার লোকটি দেখতে কতকটা গিরগিটির মতো; তাঁর দাঁতগুলো পানের পিকের রঙে ও বিড়ির ধোঁয়ায় কালো। আমাদের দেখেই বল্‌লেন, "এই যে একটাকে ধরেছেন দেখছি? মশাই, এদের জ্বালায় এই অঞ্চলের যাত্রীদের স্বস্তি নেই। চুরি লেগেই আছে। পুলিশও এদের কিছু করতে পারে না। যাক্। কি করতে চান? পুলিশে দেবেন? দিয়েই বা কি হবে?"

দত্তমশাই বললেন, "পুলিশে যা করবে তা তো বুঝছি। ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। চুরি-চামারি লোকে করে অভাবে পড়ে। ওকে কাজ দেবো।"

স্টেশন মাস্টার বললেন, "খুব ভাল কথা। কিন্তু একবার একটি ভিখিরী ছেলেকে আমিও কাজ দিতে চেয়েছিলাম। সে থাকলে না। পরে শুনলাম, ভিক্ষে করে মাইনের চেয়ে নাকি অনেক বেশি রোজগার করা যায়। তাছাড়া স্বাধীন জীবন। চুরির চেয়ে চাকরিতে কি বেশি আসে মশাই?" বলেই হে হে করে হাসতে লাগলেন।

দত্তমশাই সে কথার জবাব না দিয়ে শ্রীমান প্রদ্যোৎকে জিগ্যেস করলেন, "তোর আসল নাম কি?"

"প্রদ্যোৎ কুমার সরকার।"

"ঠিক করে বল্।"

"তাই-ই।"

"বাড়ি কোথায় ?"

"গোস্টাপুর।"

"গোসটাপুর—ঐ খালের ধারে ?"

"হ্যাঁ।"

"বাপের নাম কি ? কি করে ?"

"নাম হলো, কুঞ্জ বিহারী সরকার। বাপের দু খানা পা নেই। কাজ করতে পারে না।"

"মা, ভাই, বোন আছে ?"

"মা আর ছোট বোন আছে। মা লোকের বাড়ি ধান ভানে, কাঁথা সেলাই করে, মুড়ি ভাজে—"

"তুই পকেট মারতে আরম্ভ করেছিস কত দিন ?"

"আমি পকেটমার নই।"

"পাজামা পরা সেই ছোকরাটাকে চিনিস্ ?"

"কোন্ ছোকরা ?"

"আচ্ছা, এখন ও কথা থাক্। তুই আমার ভাগ্নে বলে পরিচয় দিয়েছিলি কেন ?"

"মনে করেছিলাম বাবুরা যদি তাই শুনে বেশি করে লবেনচুস্ কেনেন।"

"আচ্ছা। তোকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো। চল্ সেখানে খাবি পরবি থাকবি। রাখালি করবি। তোকে মাইনে দেবো মাসে বারো টাকা। চল্। যদি না যেতে চাস তো পুলিশে দেবো। কোন্‌টা চাস্ ? যাবি ?"

সে বললে, "সঙ্গে যাবো।"

অতঃপর দত্তমশাইয়ের সঙ্গে আমরা সকলে তাঁর বাড়ির পথ ধরলুম। চল্‌তে চল্‌তে সেই ভদ্রলোকটি জিগ্যেস করলেন, "তারুদা! আপনার সেই বাঘটা ?"

"তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি ভাই। ইদানীং বাইরে রাখা যেতো না, খাঁচায় থাকতো। আমার রাখাল একদিন তাকে লকড়ির খোঁচা দিয়ে মজা দেখতে গিয়েছিল। তখন বাঘটা তার হাতখানা কামড়ে আর আস্ত রাখে নি। তারপর একদিন তোমার বউদির আঁচল ধরে সে কি টানাটানি!"

ভদ্রলোকটি বললেন, "সেই জন্যই বুঝি গুলি করে মেরেছেন ?"

দত্তমশাই বললেন, "খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসছিল বলে মেরেছি—।"

"আর আপনার ভাগ্নে প্রদ্যোৎ ?"

"সে বাপের বেটা, বাপের কাছে গেছে।"

"তাহলে আপনার ঘর এখন শূন্য ? মানুষের বাচ্চা, বাঘের বাচ্চা কেউই নেই ?"

"বাচ্চা রাখার কপাল আমার নয়। কিন্তু তুমি এতদিন পরে যে ?"

"বছর কতক থেকে কোচবিহারে থাকি। আফিসের কাজেই এদিকে এলাম, আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।"

অতঃপর সব চুপচাপ চলতে লাগলাম। শ্রীমান প্রদ্যোৎ আমাদের আগে আগে চলছিল।

পথেই সন্ধ্যা বেশ ঘোর হলো। দু'পাশে জনহীন প্রান্তর। তার মাঝ দিয়ে পথটি এঁকে বেঁকে উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে। সন্ধ্যার শান্ত

বাতাস বইছে। গ্রামে দু'একটি করে আলো জ্বলে উঠছে। অন্ধকারে জোনাকি ভাসছে। দূরে শিয়াল ডেকে উঠলো। আমার বেশ লাগছিল। তবে যে কাজের জন্যে এ অঞ্চলে এসেছিলুম, তাতে কিছুটা বাধা পড়লো বলে মনের কোণে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম। কিন্তু সব কাজই তো আর নিজের ইচ্ছায় ঘটে না।

অবশেষে দত্তমশাইয়ের বাড়ি পৌঁছনো গেল। আদর-আপ্যায়নের আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠলুম।

দত্তমশাই শ্রীমান্ প্রদ্যোতেরও যথারীতি বিলি-ব্যবস্থা করলেন।

খেতে বসে রামেশ্বরের গল্পটা বেশি হলো। দত্তজায়া আমার ঘরের কথা খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন; বললেন, "একদিন দিদিকেও নিয়ে আসতে হবে কিন্তু—"

যা আর পাঁচজন ভদ্রলোক এক্ষেত্রে বলে থাকেন আমিও তাই বললুম। আহারান্তে সেই ভদ্রলোক ও আমার শয়নের ব্যবস্থাও হলো চমৎকার। শ্রীমান প্রদ্যোৎ শুলে আমাদেরই ঘরে।

তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি নে। ভোরের দিকে খুট্ করে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জিগ্যেস করলুম, "কে?"

উত্তর হলো, "আমি প্রদ্যোৎ—"

"এত ভোরে কোথায় যাচ্ছ?"

"মাঠে।"

এর উপর আর কথা চলে না।

তারপর সকাল হলো, সূর্য উঠলো। বেলাও বাড়তে লাগলো, কিন্তু শ্রীমান প্রদ্যোৎ মাঠ থেকে আর ফিরে এল না। তবে সে যাবার সময়ে

এবার কারো কিছুই নেই নি, বরং তার লজেন্স্‌গুলো ও থলিটা ফেলে গিয়েছিল।

দত্তমশাই গোসটাপুরে লোক পাঠালেন, কুঞ্জবিহারী ও তস্য পুত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমারের খোঁজ নিতে। লোকটি ফিরে এসে বললে, ওনামে ওখানে কেউ নেই। তবে একজন আছে বটে কিন্তু তার নাম কৃষ্ণবিহারী চক্রবর্তী। সে খোঁড়া নয় নুলো—ডান হাতখানা নেই। তারা মুদিখানার দোকান করে।"

দত্তমশাই বললেন, "চুকে গেল।"

সেই দিনই দত্তমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গন্তব্য পথে রওয়ানা হলুম এবং দুদিন পরে রেলপথে ফিরলুম। ফিরতি পথে নসিবপুর স্টেশনে মনে হলো যেন দেখলুম, শ্রীমান প্রদ্যোৎ মাথায় গান্ধীটুপি চড়িয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে বচসা করছে। তার হাতে লজেনসের এক গোছা প্যাকেট, কাঁধে ঝোলা। সেও একবার আমার দিকে তাকালে। কিন্তু গাড়ি তখন চল্‌ছে। আর, থেমে থাকলেও যে তার কিছু করতে পারতুম তাও নয়। উলটে সে-ই হয়তো আমাকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিত। কাজেই যা হবার হয়ে গেছে বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলুম!

শেষ